EDC 1302

শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি

Principles of Education & Methods of Teaching

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EDC 1302

শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি

সিএড প্রোগ্রাম

রচনা

এ.এস.এম. মুজাম্মিল হক

সৈয়দা তাহমিনা

নুসরাত সুলতানা

নাসরিন জাকিয়া সুলতানা

সম্পাদনা

ড. শরীফা খাতুন

সুফিয়া বেগম

রচনাশৈলী সম্পাদক

আব্দুল গনি সরকার

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EDC 1302

শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি

Principles of Education & Methods of Teaching
সিএড প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
পুনঃ মুদ্রণ ঃ ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৪
পুনঃ মুদ্রণ ঃ ২০১০

প্রচ্ছদ
মনিরুল ইসলাম

গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ আশরাফুজ্জামান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-0018-5

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণে
কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস
হেড অফিস : ২৩/১ জুরিয়াটুলি লেন
শাখা অফিস : ৮০/৪ নবাবপুর রোড
ফোন : ৭১২০৮৮৮, ৭১১৮৭৫৯

পাঠ নির্দেশনা

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী,

দুরশিক্ষণ মাধ্যমে সি এড প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে স্কুল অব এডুকেশন আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। 'শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি' বইটি স্কুল অব এডুকেশনের সি এড প্রোগ্রামের একটি আবশ্যিক কোর্সবই। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই আপনারা যাতে নিজে পড়ে বইটি বুঝতে পারেন তাই কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন।

এই বইটির পাঠ্যবস্তুকে আটটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিটে আবার একাধিক পাঠ রয়েছে।

'শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি' কোর্সবইটি পাঠ ও অনুশীলনে আপনার করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মূল কথাই হল নিজে নিজে পড়ে শেখা এবং নিচের চেষ্টায় শেখা। অন্য কথায়, এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। বস্তুত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্কুল অব এডুকেশন-এর সি এড প্রোগ্রামের বিভিন্ন কোর্সের বইগুলো রচিত। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ প্রাথমিক ভাবে একবার পড়তে আপনার ৪০-৪৫ মিনিট সময় লাগবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শেষে আপনি নিজেই নিজের পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন। এ জন্য পাঠের শেষে পাঠোত্তর প্রশ্নমালা এবং ইউনিটের শেষে রয়েছে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্নমালা।

- **সি এড প্রোগ্রামের কোর্সবই** পড়ার **সময় কী কী কাজের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে?**
  - পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন। আপনার উত্তরগুলো সঠিক হল কি না, তা পাঠের শেষে দেওয়া "সঠিক উত্তর" দেখে যাচাই করে নিন।
  - পাঠোত্তর মূল্যায়নের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নমালার উত্তরও নিজে করুন। শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলোও সঠিক হলে পরবর্তী ইউনিটে এগিয়ে যান।
  - আপনার উত্তরগুলো সঠিক না হলে পাঠগুলো আবার পড়ুন। পড়া শেষ হলে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর করুন। উত্তর সঠিক হলে পর পর পাঠে এগিয়ে যান।
  - কোন পাঠে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সে পাঠের নির্দিষ্ট অংশ আবার পড়ুন। এ ভাবে প্রতিটি ইউনিটের পাঠগুলো শেষ করুন।

বইটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নমালা	সঠিক উত্তর
চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নমালা	আবশ্যিক পাঠ

পাঠ-সহায়ক আর কী কর্মসূচি রয়েছে সি এড প্রোগ্রামে?

স্কুল অব এডুকেশন এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় টিউটোরিয়াল সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে (১ম ও ৩য় শুক্রবার) দুইটি টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসব ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।

এছাড়া স্কুল অব এডুকেশন বেতার ও টিভিতে প্রতি সপ্তাহে আপনার জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তুভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনি নির্ধারিত সময়ে ঘরে বসে এসব ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সূচিপত্র

ইউনিট-১ শিক্ষার স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১

পাঠ-১ : শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২
পাঠ-২ : শিক্ষার ধারণা ও পরিসর ৫
পাঠ-৩ : শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য ৮
পাঠ-৪ : বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১০
পাঠ-৫ : শিক্ষার স্তর ও বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা ১৫

ইউনিট-২ শিক্ষার পথিকৃৎ ২৩

পাঠ-১ : সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল ২৪
পাঠ-২ : রুশো ২৯
পাঠ-৩ : পেস্তালৎসী ও হার্বার্ট ৩৩
পাঠ-৪ : ফ্রয়েবেল ৩৭
পাঠ-৫ : ডিউই ও হোয়াইটহেড ৪০
পাঠ-৬ : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ৪৪

ইউনিট-৩ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ৪৯

পাঠ-১ : শিক্ষাক্রমের ধারণা ৫০
পাঠ-২ : শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ৫৪
পাঠ-৩ : শিক্ষাক্রমের প্রকারভেদ ৫৭
পাঠ-৪ : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ৬১
পাঠ-৫ : শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ৬৫

ইউনিট-৪ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ৬৯

পাঠ-১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো ৭০
পাঠ-২ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মূলনীতি ৭৪
পাঠ-৩ : বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ৭৭
পাঠ-৪ : বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ঃ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা এবং সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ৮২
পাঠ-৫ : পত্র যোগাযোগ ৮৯
পাঠ-৬ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৯১
পাঠ-৭ : ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতিঃ গঠন ও দায়িত্ব ৯৩
পাঠ-৮ : রেজিস্ট্রার ও নথিপত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব, তালিকা ও সংরক্ষণ কৌশল ... ৯৭
পাঠ-৯ : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও স্থানীয় জনগণের ভূমিকা ১০২

ইউনিট-৫ শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১০৭

পাঠ-১ : শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ১০৮
পাঠ-২ : শ্রেণী বিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ১১২
পাঠ-৩ : শ্রেণী পরিবেশ ১১৬

ইউনিট-৬ শিক্ষাদান পদ্ধতি ১২৩

পাঠ-১ : শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের অর্থ, সংজ্ঞা, পার্থক্য ও প্রকারভেদ...... ১২৭
পাঠ-২ : বক্তৃতা ১২৮
পাঠ-৩ : প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পদ্ধতি ১৩২
পাঠ-৪ : প্রদর্শন ও পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ১৩৭
পাঠ-৫ : পর্যবেক্ষন, পরীক্ষণ ও প্রজেক্ট পদ্ধতি ১৪৪
পাঠ-৬ : অভিনয় ও শিক্ষাভ্রমণ পদ্ধতি ১৫১
পাঠ-৭ : কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ১৫৫
পাঠ-৮ : মন্টেসরী পদ্ধতি ১৫৯
পাঠ-৯ : কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ১৬৩

ইউনিট-৭ শিক্ষণ সমস্যা ও তার প্রতিকার ১৬৭

পাঠ-১ : শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যাঃ অগ্রগামী, পশ্চাদগামী, প্রতিবন্ধী ও প্রতিকার১৬৮
পাঠ-২ : শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যাঃ যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা; দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের অভাব এবং প্রতিকার ১৭২
পাঠ-৩ : শ্রেণী শিক্ষণে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রতিকার ১৭৮

ইউনিট-৮ শিক্ষণ-শিখানো সমস্যা ১৮৩

পাঠ-১ : শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা ১৮৪
পাঠ-২ : শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা ১৮৭
পাঠ-৩ : মনিটরিয়েল পদ্ধতি ও বিশেষ শ্রেণী ১৯০
পাঠ-৪ : ইমপেক্ট পদ্ধতি ১৯৩

সংযোজন.. ১৯৬

গ্রন্থপঞ্জি.. ২০০

ইউনিট ১

শিক্ষার স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ভূমিকা

শিক্ষকতা পেশাটি শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ শিখন ও শিক্ষণ বিষয়ে সহায়তা করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যাঁরা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করবেন বা শিক্ষকতা পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন প্রথমেই তাদের 'শিক্ষা' বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা শব্দটি আমাদের প্রত্যেকেরই অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ। অথচ এই শব্দটির অর্থ আমাদের সবার কাছে এক রকম নয়। শিক্ষা কী? দশ জনের কাছে এই প্রশ্নটি করলে দশ রকম জবাব পাওয়া যেতে পারে। আপনাদেরকে পেশায় সফল হতে হলে শিক্ষার গুরুত্ব, শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ধারণা, এর প্রকৃত অর্থ, এর বিভিন্ন সংজ্ঞা ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা দরকার। শিক্ষার স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক ইউনিটে আপনারা এসব সম্বন্ধেই জানতে পারবেন। এই ইউনিটের পাঠের বিষয়বস্তুকে আমরা পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব।

পাঠ-১ : শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-২ : শিক্ষার ধারণা ও পরিসর
পাঠ-৩ : শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য
পাঠ-৪ : বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য
পাঠ-৫ : শিক্ষার স্তর ও বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা

পাঠ - ১ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন ।

শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত । মানুষ যদি শিখতে না পারত, একজন মানুষ যদি অন্য মানুষকে না শেখাতো, ছোটরা যদি বড়দের কাছ থেকে শিখে না রাখতো তাহলে মানব জাতি হয় তার আবির্ভাবের সময়ের আদিম অবস্থাতেই থাকত । না হয় বিলুপ্তই হয়ে যেতো । কারণ মানুষ জন্মের পর পর কতকগুলো মৌলিক দৈহিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না । এমন কি কোনটা তার খাবার আর কোনটা তার খাবার নয় জন্মের কয়েক মাস পরেও তার সে জ্ঞান থাকে না । সেটাও তাকে শিখতে হয় বড়দের কাছ থেকে । তবে মানুষ তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে যা শেখে শুধু যে তারই পুনরাবৃত্তি করে যায় তা নয় । প্রত্যেক প্রজন্মই তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে যা শেখে তার উপর ভিত্তি করে অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, তৈরি করে, অনেক নতুন ধারণা লাভ করে । এই ভাবেই মানুষ পরিবেশকে আরো ভালভাবে চিনতে, বুঝতে ও ব্যবহার করতে করতে দক্ষ ও কুশলী হয়ে উঠতে থাকে, সঞ্চিত হতে থাকে জ্ঞানের সম্পদ, উন্নত থেকে উন্নততরভাবে জীবন যাপনে সক্ষম হতে থাকে । এইভাবেই ঘটেছে সভ্যতার অগ্রগমন, মানবজাতি এসে পৌঁছেছে আজকের কম্পিউটার চালিত বিশ্বায়নের যুগে । এখানেই থেমে যাবে না মানুষ । মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়তেই থাকবে, যতদিন থাকবে তার অস্তিত্ব । এ সমস্তই সম্ভব শিক্ষার কল্যাণে । শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয় পূর্বপুরুষদের অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল সম্পর্কে জানা । শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয় নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে উপযুক্ত আচরণ করে টিকে থাকা এবং শিক্ষার ফলেই সম্ভব হয় ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনকে উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যাওয়া । এ সমস্ত কারণেই মানুষের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম ।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন তিনটি প্রধান কারণে । যথা–

- সঙ্গতি বিধান
- সংরক্ষণ
- অগ্রগতি সাধন

সঙ্গতি বিধান

ব্যক্তি মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে বা মানিয়ে চলতে যোগ্য করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। সঙ্গতি বিধান করে চলতে না পারলে ব্যক্তির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সঙ্গতি বিধানেরও আবার দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী আচরণ করতে সমর্থ করা; দ্বিতীয়টি হলো পরিবেশকে ব্যক্তির নিজের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা। এই দুই ব্যাপারেই মানুষকে যোগ্য করে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষা ছাড়া মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন।

সংরক্ষণ

মানব সভ্যতার আজকের যে রূপ তা আদিম রূপের থেকে আকস্মিক কোনো পরিবর্তনের ফলে তৈরি হয় নি। বরং যুগের পর যুগ ধরে চলা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আজকের সভ্যতা এই রূপ লাভ করেছে। বিবর্তনের অর্থই হচ্ছে পুরোনোর উপর ভিত্তি করে নতুন রূপায়ন। মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পুরোনো জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভাবধারা, যাকে এক কথায় বলা হয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তা এক অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদানকে ধরে রাখা ও তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।

অগ্রগতি সাধন

মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে তার বর্তমান অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারে না। সে চায় আরো ভালো অবস্থায় পৌঁছাতে। আরো ভালো অর্থাৎ উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাতে হলে তাকে অর্জন করতে হবে উন্নততর জ্ঞান, আবিষ্কার করতে হবে উন্নততর প্রযুক্তি, সৃষ্টি করতে হবে উন্নততর ভাবধারা। সবার পক্ষে আবিষ্কার করা বা তৈরি করা সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে অন্যের আবিষ্কৃত বা তৈরি করা জ্ঞান, প্রযুক্তি বা ভাবধারা আহরণ করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. মানুষের জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের নির্দেশক বিষয়ে নিচের কোন বক্তব্যটি কম উপযোগী?

ক. শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে উন্নতর অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়।
খ. শিক্ষার ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলা যায়।
গ. শিক্ষার মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল জানা যায়।
ঘ. শিক্ষা মানুষকে সব ধরনের কর্মের জন্য উপযোগী করে তোলে।

২. শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে কোনো বক্তব্যটি সঠিক?

ক. মানুষকে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলতে সহায়তা করে।
খ. দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটায়।
গ. মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে।
ঘ. মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করে।

আ) শূন্যস্থান পূরণ

১. মানবজাতির ------- টিকিয়ে রাখার জন্য -------- -------- এক অপরিহার্য উপাদান।

২. মানুষকে উন্নতর অবস্থায় পৌঁছতে হলে ---- করতে হবে উন্নতর -----।

ই) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনটি কারণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক।

আ) ১। অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ২। আবিষ্কার, প্রযুক্তি।

পাঠ - ২

শিক্ষার ধারণা ও পরিসর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- শিক্ষার পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন ।

শিক্ষার ধারণা

‘শিক্ষা’ শব্দটি বহুল প্রচলিত । নানা অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় । এগুলোকে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

- শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণা ।
- শিক্ষার ব্যাপক ধারণা ।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা

সংকীর্ণ ধারণায় শিক্ষা বলতে বোঝানো হয় কোনো বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা বা কোনো বিশেষ কৌশল আয়ত্ব করা । যেমন- স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের ও প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত কিছু পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে পাঠ গ্রহণ করাকে শিক্ষা বলা হয় । এই ধরনের শিক্ষা যিনি যত বেশি লাভ করেছেন তাকে তত বেশি শিক্ষিত বলা হয় । তাছাড়া কোনো কৌশল আয়ত্ত করাকেও শিক্ষা বলা হয় । যেমন টাইপ শিক্ষা করা বা সেলাই শিক্ষা করা । তবে আধুনিক কালে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের জন্য নির্ধারিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণ করার পর সনদ লাভ যিনি করেছেন তাকেই শিক্ষিত বলা হয় । আর যাদের এ ধরনের কোনো সনদ নেই তাদেরকে অশিক্ষিত বলেই গন্য করা হয় । শিক্ষার এই ধারণাটি বহুল প্রচলিত হলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে একে শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণাই বলা হয়ে থাকে ।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হচ্ছে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া । এই অর্থে অভিজ্ঞতা অর্জনই শিক্ষা । সুতরাং কোনো মানুষই অশিক্ষিত নন কারণ কোনো মানুষই অভিজ্ঞতাবিহীন নন । যিনি জ্যোতির্বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন তিনিও যেমন শিক্ষিত তেমনি যিনি আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে বৃষ্টি হওয়ার কতখানি সম্ভাবনা আছে সে কথা বলতে পারেন তিনিও শিক্ষিত । এই অর্থে শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই সীমিত নয় । জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে অন্যকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারার যোগ্যতা অর্জন করাও শিক্ষা । সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে, চলমান জীবনের পথে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যে কোনো ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের অবিরাম প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা । জন্ম মুহূর্ত থেকে এই প্রক্রিয়ার শুরু এবং চলতে থাকে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত । অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী ।

পরিধি

শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে বিবেচনা করলে এর পরিধির কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষা যেহেতু জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী তাই মানুষের সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডই শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। তবে মানুষ যা শেখে তার সবই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। শিক্ষা এবং শিখন এ দুটো শব্দের অর্থ আলাদা। সমস্ত শিক্ষাই শিখন কিন্তু সমস্ত শিখন (learning) শিক্ষা (education) নয়। শিক্ষার সঙ্গে একটি মানসম্মত ধারণা জড়িত। শিক্ষা বলতে শুধু সেইসব শিখনই বোঝায় যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক। যদি কোনো শিখন সমাজের জন্য অনিষ্টকর বলে বিবেচিত হয় তাহলে শিখন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন চুরি করার জন্য সিদ কাটতে শেখা শিক্ষার পর্যায়ে পড়বে না। সুতরাং শিক্ষার পরিধি এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, যে সব শিখন বা অভিজ্ঞতা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণকর সেই সব অভিজ্ঞতা শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে Ⓚ বৃত্তায়িত করুন)

১. কোনটি শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়?

ক. চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান।
খ. টাইপ শেখার দক্ষতা।
গ. নার্সিং বিদ্যা।
ঘ. চলমান জগতের অভিজ্ঞতা অর্জন।

২. প্রকৃত অর্থে শিক্ষা কেমন প্রক্রিয়া?

ক. আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া।
খ. জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
গ. বই পড়ার প্রক্রিয়া।
ঘ. আনন্দদানের প্রক্রিয়া।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ধারণা বুঝিয়ে লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ ২। খ।

পাঠ - ৩

শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন মনীষীদের দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন যুগে যুগে মনীষীরা শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরা প্রত্যেকে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন বলে শিক্ষার সংজ্ঞাও হয়েছে বিভিন্ন রকমের। এই পাঠে কতিপয় বিখ্যাত মনীষী ও শিক্ষা দার্শনিকের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

সক্রেটিসের মতে, জ্ঞানই ধর্ম। প্রত্যেক স্বাধীন কাজের পূর্বে আসে জ্ঞান। আত্মজ্ঞান বা নিজেকে জানাই মানুষের প্রধান কাজ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের বিকাশ সাধন, পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন।

প্লেটোর মতে শিক্ষা হচ্ছে, "শিশুর সহজাত গুণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।"

এরিস্টটলের মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নাম শিক্ষা।"

রুশো বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।"

পেস্তালৎসী বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ।"

হার্বার্টের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ।"

ডিউইর মতে, "ক্রমাগত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবন যাপনের নামই হচ্ছে শিক্ষা।"

হোয়াইটহেড বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে লব্ধজ্ঞান ব্যবহারের নৈপূণ্য অর্জন।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সর্বোত্তম শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা যা আমাদেরকে কেবল তথ্যই পরিবেশন করে না বরং বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

গান্ধীর মতে, "মানুষ যে সব ভালো গুণ নিয়ে জন্মায় তার সার্বিক বিকাশই শিক্ষা।"

বেগম রোকেয়ার মতে, "প্রকৃত সুশিক্ষা যাহাতে মস্তিষ্ক মন উন্নত হয়।"

কাজী আবদুল ওদুদের মতে শিক্ষা হলো, "মানুষের ভিতরকার সুপ্ত সৃষ্টিশক্তিকে সচেতন করা।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষা হচ্ছে "শিশুরা সহজাত গুণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ" এ কথা কে বলেছেন?
   ক. ডিউই
   খ. প্লেটো
   গ. গান্ধী
   ঘ. রোকেয়া

২. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিক্ষা হচ্ছে–
   ক. প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান
   খ. সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান
   গ. বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান
   ঘ. ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য বিধান

৩. মন ও মস্তিষ্ককে উন্নত করার হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে কে বিবেচনা করেছেন?
   ক. হোয়াইট হেড
   খ. ডিউই
   গ. রবীন্দ্রনাথ
   ঘ. রোকেয়া

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা সম্পর্কে রুশো ও রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ।

পাঠ - ৪

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন ।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আধুনিক কালের সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কারণ শিক্ষা হচ্ছে এমনই একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তৈরি করা যায় রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত নাগরিক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংবিধানে বর্ণিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর পরই জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ খুদা ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। এই শিক্ষা কমিশন বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ এর চার মূলনীতি : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নতুন রাষ্ট্রের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পূনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি যুগান্তকারী রিপোর্ট (১৯৭৪ সাল) প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৪

- দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব – বিশ্বের সব মানুষের জন্য মৈত্রী ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা।
- নৈতিক মূল্যবোধ – শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ যেমন – সততা ও পরোপকার, অন্যায়ের প্রতিরোধ ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি করা।
- সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ারূপে শিক্ষা – সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।
- প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা – দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা – শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেয়ার ও সংগঠন তৈরির গুণাবলীর বিকাশ সাধনের, সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির ও গবেষণা করার মনোভাব ও যোগ্যতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- কায়িক শ্রমের মর্যাদা দান – কায়িক শ্রমের মর্যাদা দানের মনোভাব তৈরির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৯৭৫ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর এদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। এর ফলে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪) ও এই রিপোর্টে উল্লেখিত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৮

পরবর্তী সময়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূনর্গঠনের জন্য ১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে এই শিক্ষা কমিশন জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করে। এগুলো নিম্নরূপ :

- দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।
- দেশ থেকে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো।
- সামজের প্রতি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়া।
- নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।
- আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।
- বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।
- শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের সাহায্যে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
- বিশ্বের সকল দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজ সচেতন মানুষে পরিণত করা।
- মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটানো।

এই কমিশনের রিপোর্টও বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান সরকার দেশে শিক্ষার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছেন। আমরা আশা করি তাদের সুপারিশ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাবো। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিভিন্ন সময় গঠিত শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। এর সাথে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য মতামত গ্রহণ করা হয়। এসব সূত্র সম্মিলিতভাবে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করা হয়।

- দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে শিশুর সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য।
- এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে :
- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।
- সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।
- পারস্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- কায়িক শ্রমের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে তার অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- সুনাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে অধিকার অর্জনে এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা।
- জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অভ্যাস ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।
- ভাষা, সংখ্যাজ্ঞান ও হিসাব সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিখন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করা।

- শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা ।
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বোঝা এবং এর প্রয়োগে আগ্রহী করে তোলা ।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা ।
- শিক্ষার্থীর মনে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলা এবং পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা ।
- বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা ।
- সমগ্র মানবজাতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মনে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগিয়ে তোলা ।
- বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন এবং ব্যবহারে সহায়তা করা ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
   - ক. ড. কুদরাত-এ-খুদা
   - খ. অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ
   - গ. মাওলানা আকরাম খান
   - ঘ. জনাব আতাউর রহমান

২. জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
   - ক. সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি
   - খ. সংবিধানের মূলনীতি
   - গ. দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ
   - ঘ. দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ

৩. প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কোনটি?
   - ক. শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা
   - খ. শিশুর সামাজিক বিকাশ সাধন
   - গ. শিশুর সার্বিক বিকাশ সাধন
   - ঘ. শিশুর আবেগিক বিকাশ সাধন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলির একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।ক, ২।খ, ৩।গ।

পাঠ - ৫

শিক্ষার স্তর ও বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরগুলো সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

শিক্ষার স্তর

আমরা জানি যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তনই শিক্ষা। এই মূল লক্ষ্যে আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিচালিত হয়। নানা প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মেয়াদ, শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি কার্যাবলি নির্দিষ্ট থাকে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বয়ঃক্রম হিসাবে প্রধানত তিনটি স্তরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে ভাগ করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুদের জন্য প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

<table>
<tr><td>২২+</td><td></td><td colspan="2">ডক্টরেট
এম.ফিল</td><td rowspan="5">উচ্চ শিক্ষা</td></tr>
<tr><td>২১</td><td>১৬</td><td>মাস্টার্স</td><td>মাস্টার্স</td></tr>
<tr><td>২০</td><td>১৫</td><td rowspan="3">স্নাতক
(সম্মান)</td><td rowspan="3">স্নাতক (পাস)</td></tr>
<tr><td>১৯</td><td>১৪</td></tr>
<tr><td>১৮</td><td>১৩</td></tr>
<tr><td>১৭</td><td>১২</td><td colspan="3" rowspan="2">উচ্চ মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>১১</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>১০</td><td colspan="3" rowspan="2">মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>৯</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>৮</td><td colspan="3" rowspan="3">নিম্ন মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>৫</td><td colspan="3" rowspan="5">প্রাথমিক</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>৩</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>২</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>১</td></tr>
<tr><td>৫</td><td></td><td colspan="3" rowspan="3">প্রাক-প্রাথমিক</td></tr>
<tr><td>৪</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বয়স</td><td>শ্রেণী</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

চিত্রঃ ১ বাংলাদেশের শিক্ষার কাঠামো
উৎস ঃ শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব, ১৯৯৫ সন

প্রাক-প্রাথমিক স্তর

তিন থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য নার্সারী, কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও কিছু কিছু প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রধানত শহরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রাথমিক স্তর

ছয় থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের শিক্ষা এই স্তরে দেওয়া হয়। শ্রেণী হিসাবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলসমূহে এবং মাধ্যমিক স্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক সেকশনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

এই স্তরের শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর।

মাধ্যমিক স্তর

প্রাথমিক উত্তর কিশোর ও তরুণদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাত বছর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্তরের ১১ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। এই স্তরের শিক্ষা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা: নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। এগার থেকে তের পর্যন্ত বয়ঃসীমার ছেলেমেয়েরা এই স্তরে অধ্যয়ন করে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দুই বছর মেয়াদী, নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত। চৌদ্দ থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েরা এই স্তরে অধ্যয়ন করে। উচ্চ মাধ্যমিকের মেয়াদ দুই বছর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তরে বয়ঃসীমা ১৬ থেকে ১৭+ বছর পর্যন্ত। বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস নিচের চিত্রে দ্রষ্টব্য:

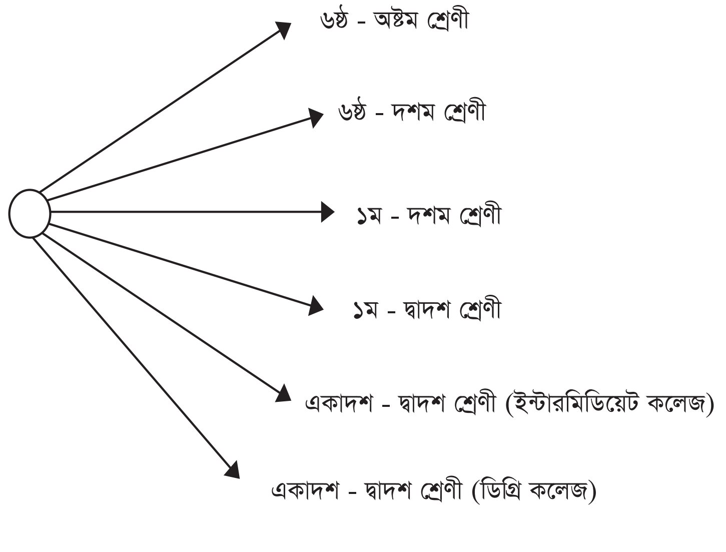

চিত্র ঃ ২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

উচ্চশিক্ষা স্তর

আঠার ও তদুর্ধ বয়ঃসীমার তরুণ তরুণীরা উচ্চশিক্ষা স্তরে অধ্যয়ন করে। এই স্তরের শিক্ষার মেয়াদ দুই থেকে ছয় বছর পর্যন্ত। একাডেমিক কার্যক্রমের ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে উচ্চ শিক্ষার কার্যকালের পার্থক্য দেখা যায়। যেমনঃ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক সম্মান চার বছরের কার্যক্রম। অপরদিকে প্রকৌশল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে স্নাতক ডিগ্রির সময়কাল ৪-৫ বছর পর্যন্ত।

নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রি, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়।

শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা

একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে মেধা, ক্ষমতা ও আগ্রহের বিভিন্নতা থাকে; সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজনও থাকে বিভিন্ন রকমের। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের সব সময়ই বৃত্তি বা পেশার প্রস্তুতিমূলক বা পেশাভিত্তিক অথবা আগ্রহ বা ক্ষমতাভিত্তিক বিভিন্নমুখী শিক্ষাধারার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় শিক্ষার উপব্যবস্থা। (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)

আমাদের দেশের প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে দুটো উপ-ব্যবস্থা আছে।

- সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা
- মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা

সাধারণত প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের উপধারায় একমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

অপর পৃষ্ঠায় চিত্র-৩ এ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার চিত্র তালিকা দেখানো হলো :

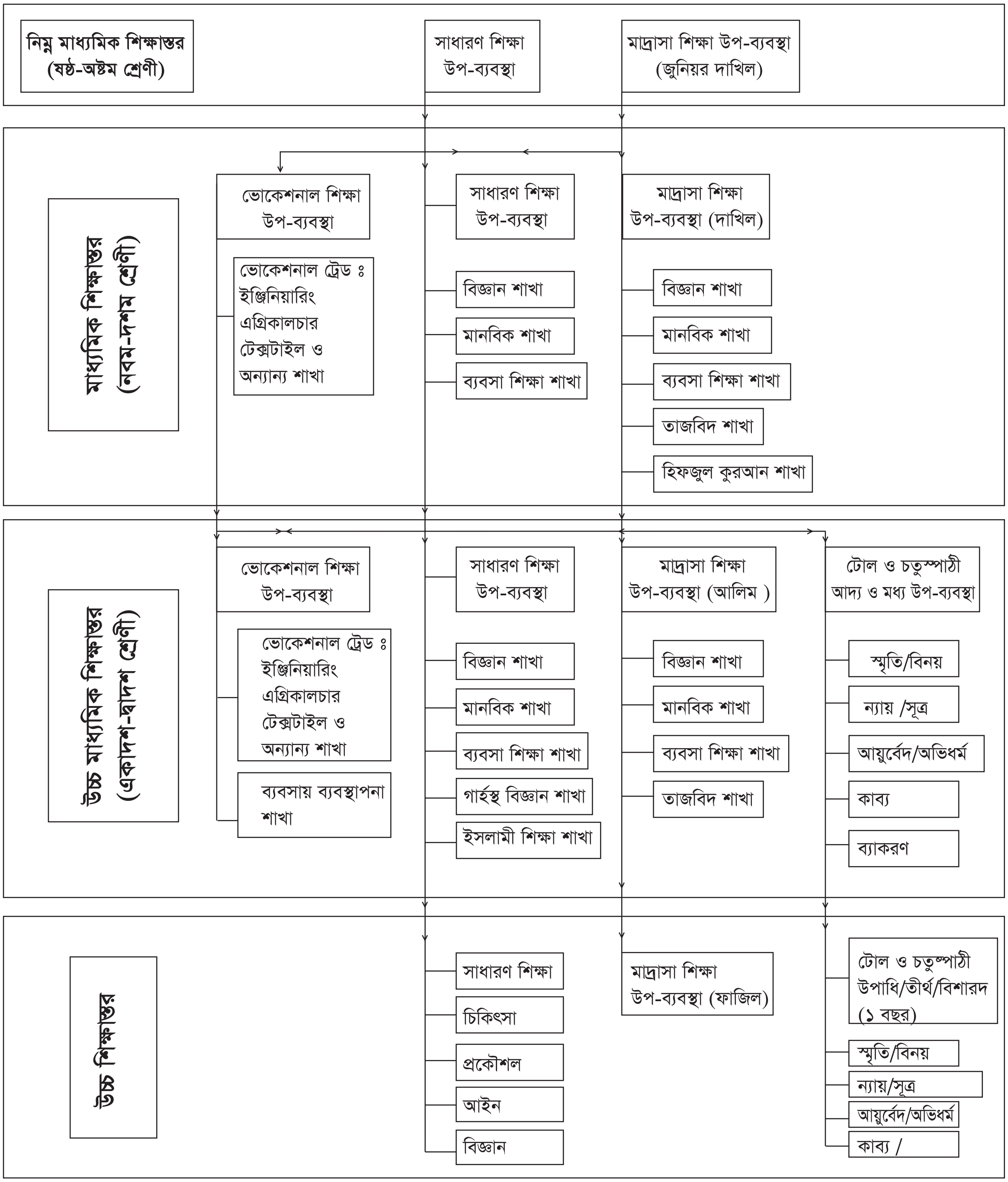

চিত্র ঃ শিক্ষাস্তরের উপ-ব্যবস্থা

উৎস ঃ (১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড, বাংলাদেশ, ১৯৯৫

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের চেয়ারম্যানের সৌজন্যে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উপ-ব্যবস্থা চারটি :

- ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা
- সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা
- মাদ্রাসা শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা
- টোল ও চতুষ্পাঠী উপ-ব্যবস্থা

এই চারটি উপ-ব্যবস্থার প্রত্যেকটিরই বেশ কয়েকটি করে শাখা রয়েছে। যেমন: ভোকেশনাল শিক্ষায় বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেড- ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, টেক্সটাইল, ইত্যাদি শাখা; সাধারণ শিক্ষা উপ-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, মানবিক ইত্যাদি শাখা; মাদ্রাসা উপ-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, মানবিক, তাজবিদ ইত্যাদি শাখা।

সংস্কৃত বা পালি টোল ও চতুষ্পাঠী উপ-ব্যবস্থার ধরন অন্য তিনটি থেকে একটু আলাদা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের প্রারম্ভিক ন্যূনতম যোগ্যতা এস.এস.সি পাস। এখানে কোর্স সমাপ্ত করতে উচ্চ মাধ্যমিকের চেয়ে এক বছর বেশি অর্থাৎ মোট তিন বছর লাগে। টোল বা চতুষ্পাঠীতে বেশ কয়টি শাখা আছে।

উচ্চতর শিক্ষা স্তরেও বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন- সাধারণ উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, আইন, ব্যবসা, চারু ও কারুকলা এবং বিভিন্ন প্রকারের টেকনিক্যাল কোর্স।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. আমাদের দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলত কয়টি স্তর?
   - ক. পাঁচটি
   - খ. চারটি
   - গ. দুইটি
   - ঘ. তিনটি

২. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সময়সীমা কয় বছর?
   - ক. ২ বছর
   - খ. ৩ বছর
   - গ. ৫ বছর
   - ঘ. ৭ বছর

৩. উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপ-ব্যবস্থা কয়টি?
   - ক. তিনটি
   - খ. পাঁচটি
   - গ. চারটি
   - ঘ. দুইটি

৪. টোল ও চতুষ্পাঠী শিক্ষা
   - ক. ৯ বছর
   - খ. ২ বছর
   - গ. ৫ বছর
   - ঘ. ৩ বছর

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সম্পর্কে টীকা লিখুন।

ই) ব্যবহারিক কাজ

১. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরের কাঠামোর একটি চিত্র অঙ্কন করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কীভাবে নির্ণয় করা হয়?
   - ক. বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে।
   - খ. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে।
   - গ. দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত যাচাই করে।
   - ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ।

২. "শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ"- শিক্ষার এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
   - ক. রুশো
   - খ. প্লেটো
   - গ. হার্বার্ট
   - ঘ. ডিউই

৩. নিম্নের কোনটি শিক্ষার স্তর নয়?
   - ক. প্রাথমিক শিক্ষা
   - খ. মাধ্যমিক শিক্ষা
   - গ. উচ্চ শিক্ষা
   - ঘ. সাধারণ শিক্ষা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

২. শিক্ষার তিনটি সংজ্ঞা লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। ঘ।

ইউনিট ২

শিক্ষায় পথিকৃৎ

ভূমিকা

মানব জাতির ইতিহাসে এমন এক এক জন মনীষী জন্মেছেন যাঁদের আদর্শ, মতবাদ বা বৈপ্লবিক ভাবধারা শিক্ষার উদ্দেশ্য, নীতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এইসব মনীষী তাঁদের সময়কার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অপূর্ণতা, গতানুগতিকতা ও অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং পথ তৈরি করে দিয়েছেন নতুন যুগের উপযোগী কার্যকর লক্ষ্য ও পদ্ধতির। এ জন্যই আমরা তাঁদেরকে শিক্ষার পথিকৃৎ বলে থাকি। এইসব মনীষী তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও জীবন দর্শন অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। মানব জাতির জীবন ধারা আজও বহমান। আজও মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে আরো উন্নততর জীবন যাপনের। সেজন্য প্রয়োজন উন্নততর শিক্ষার। প্রতি যুগেই উন্নততর শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনা যুগিয়ে থাকে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের মৌলিক চিন্তাধারা। বর্তমান ইউনিটে আপনারা ঐ রকম কয়েকজন পথিকৃৎ এর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ-১ : সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল

পাঠ-২ : রুশো

পাঠ-৩ : পেস্তালৎসী ও হার্বার্ট

পাঠ-৪ : ফ্রয়েবেল

পাঠ-৫ : ডিউই ও হোয়াইটহেড

পাঠ-৬ : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

পাঠ - ১

সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সক্রেটিসের শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতি বলতে পারবেন ।
- এরিস্টটলের শিক্ষাতত্ত্ব ও নীতি সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে পারবেন ।

সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিঃ পূঃ)

সক্রেটিস ছেলেবেলায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেন নি । বড় হবার পর তিনি নিজের চেষ্টায় দর্শন সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয় ।

শিক্ষার লক্ষ্য

সক্রেটিসের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ভ্রান্তি দূর করে সত্যকে জানা অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর করে জ্ঞান অর্জন করা । তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয় তখনই যখন আমরা দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জানি । সেই জন্যেই তিনি বলেছেন 'know thyself' 'নিজেকে জানো' । দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় অর্থাৎ নৈতিক সদগুণাবলি সম্বন্ধে । তিনি আরো বলেছেন শিক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে এই সদগুণাবলি সম্পর্কে সচেতন করা । তাঁর মতে জ্ঞানই সদগুণ । অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করলেই মানুষ সদগুণের অধিকারী হয় । সক্রেটিসের কাছে পরিণত যুবকেরাই আসত উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় । আর তিনি তাদেরকে সদগুণাবলির প্রকৃতি, সমাজ ও জীবনের সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করে সমস্যার গুঢ় তত্ত্ব অনুধাবনের সুযোগ করে দিতেন ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

শিক্ষার পদ্ধতি

সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনো বিষয়ের সর্বজনীন সংজ্ঞা বা কোনো সমস্যার সমাধান তিনি শিক্ষার্থীকে বলে দিতেন না । বরং এমনভাবে প্রশ্ন করতেন এবং উত্তর আদায় করতেন যে শিক্ষার্থী যৌক্তিক চিন্তার পরস্পরা ধরে নিজেই সমাধানে পৌঁছে যেত । পরবর্তীকালের মনীষীরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন আরোহী পদ্ধতি । সক্রেটিস উদ্ভাবিত পদ্ধতি বলে এটিকে সক্রেটিক পদ্ধতিও বলা হয় । শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি আজো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত ।

প্লেটো (৪২৮-৩৪৮খ্রিঃ পূঃ)

জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্লেটো প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । বিশ থেকে আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সক্রেটিসের কাছে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন । তিনি অনেক বই লিখেছেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বইয়ের নাম হলো 'রিপাবলিক', 'সিম্পোজিয়াম', 'ক্রিটো মেনো', 'লজ' । তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম ছিল একাডেমী ।

প্লেটো ব্যক্তি জীবনের নৈতিক মানকে উন্নত করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর মতে ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে প্রকৃত আদর্শের দিকে পরিচালিত করাই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূল কথা হলো নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমাজে জীবন ধারনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্লেটো ছেলে ও মেয়েতে কোনো পার্থক্য করেন নাই। শিক্ষা প্রাথমিকভাবে সবার জন্য একই রকম হবে। পরে তা তিন ধারায় হবে। প্লেটোর মতে যেহেতু সমাজে তিন ধরনের কর্মের মানুষ আছে তাই তিন শ্রেণীর শিক্ষা তিন রকমের হবে। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করার দক্ষতা থাকে; এদেরকে সেই অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। এরা হবে আর্টিসান (artisan)। আর এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শক্তি ও সাহস বেশি থাকে। এদেরকে সৈনিক (soldier) হবার শিক্ষা দিতে হবে। আর এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মেধা ও জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা ও আগ্রহ বেশি থাকে। এদেরকে শাসন-যন্ত্র পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য

যে সব বিষয় শিক্ষার্থীর মধ্যে সদগুণ বা নীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে প্লেটো শিক্ষাক্রমের মধ্যে সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। এগুলোর মধ্যে থাকবে আদর্শমুখী বা আধ্যাত্মিক গল্প, সঙ্গীত, শিল্পকলা, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, শরীরচর্চা ইত্যাদি।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

প্লেটো শিশুদের জন্য গল্প, খেলা ও আদর্শ অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। পরিণত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি প্রধানত ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও দলগত আলোচনা পদ্ধতির বিধান দিয়েছেন।

শিক্ষার পদ্ধতি

এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূঃ)

প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি দীর্ঘ বারো বছর ছাত্র ও সহকর্মী হিসেবে প্লেটোর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো: 'পলিটিক্স', 'লজিক', 'নিকোমেকিয়ান এথিক্স'।

শিক্ষার লক্ষ্য

এরিস্টটলের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ লাভ। তাঁর মতে মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী প্রাণী তাই সে কেবল যুক্তিসম্মত আচরণ করার মাধ্যমেই সুখ লাভ করতে পারে। তাই শিক্ষার্থীকে যুক্তি প্রয়োগে দক্ষ করে তোলাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। তবে যুক্তি প্রয়োগে যোগ্য হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত শিশুদেরকে সৎ আচরণ অনুশীলন করিয়ে তা তাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

এরিস্টটল চেয়েছেন শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করতে। তাই যে সব বিষয় সুস্থ শরীর ও মন তৈরির ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে তার সবই তাঁর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে জন্য তিনি শরীরচর্চা ও সঙ্গীতের উপর জোর দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, বিভিন্ন বিজ্ঞান, সামাজিক বিদ্যা ও নানা ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শিক্ষার পদ্ধতি

এরিস্টটল শিক্ষাদানে আরোহী পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলেছেন। তবে তা কেবল তাত্ত্বিক বা চিন্তাভিত্তিক হবে না, তা ব্যবহারিকও হবে। তাঁর মতে প্রথমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তারপর বুদ্ধি বা যুক্তি প্রয়োগ করে

সেগুলো থেকে সাধারণ বা সার্বিক সূত্র তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতির কথা এরিস্টটলই প্রথম বলেছিলেন এবং এই নিয়ম আজ পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে।

সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল, প্রাচীন গ্রীক দর্শনের এই তিন দিকপাল শিক্ষার্থীকে যুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার উপর জোর দিয়েছেন এবং এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদেরকেই তাঁরা রাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করার কথা বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সক্রেটিস কখন জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে
   খ. ৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে
   গ. ৪৭০ খ্রিষ্টপূর্বে
   ঘ. ৫৭০ খ্রিষ্টপূর্বে

২. 'জ্ঞানই সদ্‌গুণ' একথা কে বলেছিলেন?
   ক. প্লেটো
   খ. থেলিস
   গ. সক্রেটিস
   ঘ. এরিস্টটল

৩. প্লেটোর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম কী?
   ক. জিমন্যাসিয়াম
   খ. লাইসিয়াম
   গ. সিম্পোজিয়াম
   ঘ. একাডেমী

৪. এরিস্টটল কার ছাত্র ছিলেন?
   ক. সক্রেটিস
   খ. থেলিস
   গ. ক্রীটো
   ঘ. প্লেটো

৫. এরিস্টটল মানুষকে সদগুণসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য শিশুদেরকে কী করতে বলেছেন?
   ক. সদগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে
   খ. অসৎ আচরণ করলে শাস্তি দিতে
   গ. সৎ আচরণে অভ্যস্ত করে তুলতে
   ঘ. সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের গল্প বলতে

৬. সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে সবচেয়ে বেশি সম্মান পাবার যোগ্য কোন ধরনের ব্যক্তি?
   ক. প্রচুর ধনের অধিকারী
   খ. প্রচুর শক্তির অধিকারী
   গ. কৌশল ব্যবহারে দক্ষ
   ঘ. যুক্তি ব্যবহারে দক্ষ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সক্রেটিসের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে শিক্ষার লক্ষ্য কী? তুলনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ঘ, ৫। গ, ৬। ঘ।

পাঠ - ২

জ্যাঁ জ্যাকস রুশো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রিঃ)

রুশো আঠার শতকের গতানুগতিক চিন্তা ধারায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন । তাঁর চিন্তাধারা শুধু যে সে যুগের সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল তাই নয় শিক্ষানীতিকেও প্রভাবিত করেছিল । তাই তাঁকে আধুনিককালের যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষা চিন্তাবিদ হিসেবে স্থান দেওয়া হয় । তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই 'দি সোশাল কন্ট্রাক্ট' এবং 'এমিল' যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর অভিনব বৈপ্লবিক মতবাদের স্বাক্ষর ।

শিক্ষাতত্ত্ব

রুশোর শিক্ষা দর্শনকে প্রকৃতিবাদ বলা হয় । তাঁর মতে প্রকৃতিই মানুষের শিক্ষক । প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের সকল সত্তার বিকাশ হয় । মধ্য যুগের নিষ্পেষণমূলক শিক্ষা ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ বন্ধ করে দিতো । তাই তিনি প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলেছেন । রুশো তাঁর এই শিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্ব 'এমিল' উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন । এক কাল্পনিক শিশুকে কেন্দ্র করে রুশো তাঁর শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক এই বইতে বিশ্লেষণ করেছেন । তাঁর তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রে । প্রকৃতি বলতে রুশো কী বুঝিয়েছেন আসুন আমরা একটু আলোচনা করি । তিনি প্রকৃতিকে তিন অর্থে ব্যবহার করেছেন । এই তিন ধরনের প্রকৃতি থেকে শিশু তিন ধরনের শিক্ষা পায় ।

- জৈব প্রকৃতির মাধ্যমে জৈবিক বিকাশ হয় ।
- মনো প্রকৃতির মাধ্যমে সে মানুষের সমাজ থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তার জৈবিক বিকাশকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে ।
- জাগতিক প্রকৃতির মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ।

শিক্ষার লক্ষ্য

রুশো শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলাদা করে কিছু উল্লেখ করেন নি । 'এমিল'– এর বক্তব্য থেকে বলা যায় যে, তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ, যে বিকাশের মাধ্যমে সে পরিপূর্ণ স্বাভাবিক সুসামঞ্জস্য ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকারী হবে ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

শিক্ষার জন্য তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রচনা করেন নি । তাঁর মতে প্রকৃতিই হচ্ছে শিশুর পাঠ্য বিষয় । বারো বছর বয়স পর্যন্ত সে তার জড় ও জীব পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করেই জ্ঞান অর্জন করবে । সেই সাথে শরীরকে শক্ত ও সুগঠিত করার জন্য শরীরচর্চা করবে । এরপর সে কিছু বইপুস্তক পাঠ করবে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জীবন সম্পর্কে জানবে । তারপর দেশ ভ্রমণ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে । একটু বড় হলে তারা

স্থানীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে মেয়েদের জন্য তিনি শুধু ঘরকন্না ও সন্তানপালন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি

রুশো প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন উপায়ে শিক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিশু প্রথম জীবনের অর্থাৎ বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে নেতিবাচক পদ্ধতিতে। এই সময় শিশুকে কোনো সত্য বা সদগুণ শিখানো হবে না। 'এটা কর' যেমন বলা যাবে না 'ওটা কর না' তাও তেমনি বলা যাবে না। তার সমস্ত শিক্ষাই সম্পন্ন হবে তার প্রকৃতি, তার সহজাত শক্তি এবং স্বাভাবিক আগ্রহ বিকাশের মধ্যে দিয়ে। তার মন যেন মন্দের দিকে না যায় বা সে যেন কোনো বড় রকমের বিপদে না পড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশু সৎ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। এ সময় তার অভ্যাস গঠনের কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক প্রভাবেই শিশুর মানসিক শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা হবে। অনুরূপভাবে শিশু তার 'ভালো বা মন্দ কাজের' জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। রুশো এই তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন 'প্রাকৃতিক ফলাফল তত্ত্ব'। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো যাক। বেড়াতে যাবার সময় শিশু পোষাক পরতে দেরী করছে, তাই তাকে বাড়িতেই রেখে যাওয়া হোক। বৃষ্টিতে ভিজে যদি তার সর্দি হয় তখন সে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতে বাধ্য হবে। এক কথায় সমস্ত কাজেরই স্বাভাবিক ফলাফল শিশু ভোগ করবে এবং সে ভাবে কোন কাজটা ভাল বা কোনোটি মন্দ তা সে শিখবে।

রুশো তাঁর কাল্পনিক শিশু এমিলের জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী তার শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন।

জীবন বিকাশের স্তর ও শিক্ষার পরিকল্পনা

- **এক থেকে** পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা : এ সময়ে শিশুর শিক্ষা হবে শরীরকে কেন্দ্র করে। এ সময় তার মানসিক ও নৈতিক বিকাশের প্রতি কোনো রকম মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।
- পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সের শিক্ষা : এ পর্যায়ের শিক্ষা নিছক ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলোর অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নেতিবাচক শিক্ষণ ও প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব অনুসারে এই বয়সের শিশুর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে।
- **বারো থেকে পনের বছর বয়সের শিক্ষা :** কৈশোরের ইতিবাচক শিক্ষা শুরু হবে এই বয়স থেকে। তার কৌতূহলবোধ থেকেই পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করতে হবে। সে যা জানতে ও শিখতে আগ্রহবোধ করবে তাই শিখবে। প্রচলিত শিক্ষাক্রমের বিষয় তাকে শিখতে দেওয়া হবে না। রুশোর মতে 'রবিনসন ক্রুসো' এই বয়সের শিশু পড়তে পারে। এই বই থেকে সে আত্মনির্ভর প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন যাপন ও প্রচলিত জ্ঞানের অসারতা ইত্যাদি জানতে পারবে।
- **পনের থেকে বিশ বছর বয়সের শিক্ষা :** এ বয়স থেকে শুরু হবে এমিলের হৃদয়ের শিক্ষা। এতদিন সে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু এখন থেকে শুরু হবে সমাজের অন্যান্যদের সাথে তার সম্পর্কের শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রধান উপকরণ হবে অন্যের প্রতি ভালবাসা।
- **মেয়েদের শিক্ষা :** মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি পুরাতনপন্থী ছিলেন। তাঁর মতে ঘরকন্না করা ও পুরুষের জীবনসঙ্গী হওয়াই মেয়েদের জীবনের

প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য সুগৃহিনী হওয়ার উপযোগী করেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

রুশোর শিক্ষানীতি

রুশোর 'এমিল' গ্রন্থ থেকে আমরা নিম্নের কতিপয় শিক্ষানীতি গঠন করতে পারি :

- শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী।
- শিক্ষা একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা তথ্য বা জ্ঞান অর্জন নয়। শিশুর প্রকৃতি দত্ত ইন্দ্রিয়, মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশই হলো প্রকৃত শিক্ষা।
- শিশুর প্রকৃতি, ইচ্ছা ও চাহিদা দ্বারা তার শিক্ষা নির্ধারিত হবে।
- শিশুর ব্যক্তি সত্তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।
- শিশুকে ভালো করে বুঝে তাকে শেখানো উচিত।
- শিশুর শারীরিক সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ।
- শিশুর শিক্ষার বিষয়বস্তু তার আগ্রহ ও কৌতূহল দ্বারা নির্ধারিত হবে। তার শিক্ষায় বিমূর্ত শিক্ষার বদলে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষা কার্যক্রম প্রাধান্য পাবে।
- প্রকৃত শিক্ষা আসবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

রুশোর শিক্ষা মতবাদে স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন ইত্যাদি ত্রুটি থাকলেও একথা সত্য যে তিনি আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষানীতির প্রবক্তা। বর্তমান কালের প্রগতিশীল ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি তাঁর মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. রুশোর শিক্ষা সম্পর্কিত বই কোনটি?
   ক. দি সোশাল কন্ট্রাক্ট
   খ. এডুকেশন এণ্ড ম্যান
   গ. এমিল
   ঘ. রিপাবলিক

২. রুশো শিশুর শিক্ষার জন্য কোন পরিবেশকে উপযুক্ত বলে মনে করেছেন?
   ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ
   খ. গৃহের পরিবেশ
   গ. বিদালয়ের পরিবেশ
   ঘ. সামাজিক পরিবেশ

৩. রুশোর মতাদর্শের ভিত্তিতে কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে?
   ক. পরিবেশকেন্দ্রিক
   খ. শিক্ষককেন্দ্রিক
   গ. কর্মকেন্দ্রিক
   ঘ. শিশুকেন্দ্রিক

৪. শিশুদের নেতিবাচক শিক্ষার সময়কাল কত?
   ক. শিশুর বার বছর বয়স পর্যন্ত
   খ. শিশুর ছয় বছর বয়স পর্যন্ত
   গ. কিশোর উত্তীর্ণকাল পর্যন্ত
   ঘ. ছেলেমেয়েদের পনের থেকে বিশ বছর পর্যন্ত

৫. নিচের কোনটি রুশোর শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী
   খ. শিশুর ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা দিতে হবে
   গ. প্রকৃত শিক্ষা হবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে
   ঘ. শিশুর শিক্ষা বিমূর্ত স্তরের হবে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান দিকগুলো লিখুন।
২. রুশোর শিক্ষানীতিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। ঘ, ৪। ক, ৫। ঘ।

পাঠ - ৩

পেস্তালৎসী ও হার্বার্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পেস্তালৎসীর শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- হার্বার্টের শিক্ষানীতি উল্লেখ করতে পারবেন।

যোহান হেনরিক পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭ খ্রিঃ)

পেস্তালৎসী স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে প্রথমে ধর্মযাজক হবার জন্য পড়াশোনা করেন। এরপর আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কৃষিবিদ হওয়ার জন্যও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি শিক্ষক হন এবং শিক্ষক ও শিক্ষাবিজ্ঞানী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

পেস্তালৎসী শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুমনকে জানার ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর বিবেচনায় শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার স্বাভাবিক, প্রগতিশীল ও সুষম বিকাশ। তাঁর মতে, কেবল ব্যক্তির বিকাশ নয় সমাজের অগ্রগতি এবং সামাজিক মঙ্গলও শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন অধঃপতিত মানব সমাজকে কলুষতা থেকে মুক্ত করার একমাত্র পন্থা হলো শিক্ষা। তাই তাঁর মতে শিক্ষায় থাকবে সব স্তরের সব মানুষের সমান দাবী। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে উন্নততর সমাজ জীবনের উপযুক্ত মানুষ তৈরি করা। উপযুক্ত মানুষ হতে হলে কেবল জ্ঞান আহরণ করাই যথেষ্ট নয়। মানুষকে উপার্জনক্ষমও হতে হবে। সুতরাং শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্য হলো মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা। এজন্য তিনি শিক্ষার্থীকে শিল্পকলা শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

পেস্তালৎসীর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক মানসিক শক্তি হচ্ছে গণনা করার শক্তি, পরিমাপ করার শক্তি ও কথাবলার শক্তি। এজন্য তিনি গণিত ও ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। এই বিষয়গুলোর শিক্ষাকে বাস্তবভিত্তিক করার জন্য তিনি প্রকৃতি পাঠ ও পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেছেন। এছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, নৈতিক শিক্ষা, সঙ্গীত ও শরীর চর্চা তার পাঠক্রমের অঙ্গ ছিল।

শিক্ষার পদ্ধতি

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পেস্তালৎসী যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তার নাম দেন বস্তুভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মুলনীতি হলো শিশুর শিক্ষা হবে বস্তুকেন্দ্রিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। এর মাধ্যমেই শিশু ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, জ্ঞান অর্জন, মনের বিকাশ এবং ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকবে। শুধু মৌখিক বর্ণনা শুনে শেখার চাইতে এই পদ্ধতিতে শেখা স্থায়ী হবে।

পেস্তালৎসীর শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করে আমরা নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো পাই :

সার সংক্ষেপ

- শিক্ষা হলো শিশুর সহজাত সামর্থ। শক্তি ও বৃত্তিগুলোর সুষম বিকাশ।
- শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর পূর্ণ বিকাশ হয়।
- শিক্ষা হবে সর্বজনীন।
- শিশুর সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে তার বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংহত কার্যাবলীর মাধ্যমে।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও আবহাওয়া হবে গৃহের মতো স্নেহ ও আন্তরিকতাময়।
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই শেখার সূচনা হয়। তাই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশ এবং তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

যোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিঃ)

হার্বার্ট ছিলেন একজন উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো টেক্সটবুক অব সাইকোলজি, সাইকোলজি অ্যাজ এ সায়েন্স, দি সায়েন্স অফ এডুকেশন।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

হার্বার্ট একজন দার্শনিক ছিলেন। শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে যে তার মনের প্রকৃতিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এ কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই মনের প্রকৃতি কী রকম, মন কীভাবে কাজ করে এ সম্পর্কে তিনি যুক্তিসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। তাঁর মতে জন্মের সময় শিশুর মন শূন্য থাকে। জন্মের পর থেকে সে নানান অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এই অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে জমা হতে থাকে এবং একটা ভাবমণ্ডলী তৈরি করে। মনের সামনে নতুন কোনো অভিজ্ঞতা এলে পুরানো অভিজ্ঞতামণ্ডলীর সঙ্গে তার যোগ বা মিল থাকলে মন তাকে গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার আগ্রহ হলো শিক্ষার্থীর মনে পুরানো ভাব বা ধারণা কর্তৃক নতুন ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা। তিনি এই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন আগ্রহের তত্ত্ব। তাঁর মতে আগ্রহ ছাড়া শিক্ষণ হয় না। আগ্রহ দুই রকম– স্বতঃস্ফূর্ত ও আরোপিত। শিক্ষার্থী কারো প্রভাব ছাড়া যখন কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহী হয় তাকে বলা হয় স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ। আর পরিবেশ সৃষ্টি করে যখন আগ্রহ জাগানো হয় তখন তাকে বলে আরোপিত আগ্রহ। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এই আরোপিত আগ্রহের মাধ্যমেই শিক্ষিত করে তোলেন।

হার্বার্ট বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিকতা। নৈতিক চরিত্র গঠন ও সদগুণের বিকাশই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞান বা নীতিবোধকে একটি জীবন্ত অভ্যাসে পরিণত করার যে কৌশল, হার্বার্টের মতে তাই হচ্ছে শিক্ষা। তিনি শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন যাতে সে স্বভাবতই সত্য সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট হয়। এজন্য তার মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তব কাজ করতে করতে তারা ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজ সম্বন্ধে জানবে এবং অন্যায় ও অসত্যকে বাদ দিয়ে ন্যায় ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট হতে শিখবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

হার্বার্ট বলেছেন মানব সভ্যতার এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাদান শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হবে। এজন্য মানবজাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। হার্বার্ট মনে করেন শিশুর শিক্ষাক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে যা তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত হবে এবং যার প্রতি তার আগ্রহ জন্মেছে।

শিক্ষার পদ্ধতি

হার্বার্ট পঞ্চসোপান নামে একটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ বা সম্পর্ক তৈরি করে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা। হার্বার্ট তাঁর পদ্ধতিকে শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য করে তোলার জন্য পাঠ পরিকল্পনার একটি ছক তৈরি করেছিলেন। কিছুটা পরিমার্জিতরূপে সেই ছকটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আজও ব্যবহর করা হচ্ছে। হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির ধাপগুলো হলো : প্রস্তুতি (Preparation), উপস্থাপন (Presentation), অনুষঙ্গস্থাপন (Association), সামান্যীকরণ (Generalization) এবং প্রয়োগ (Application)।

সার সংক্ষেপ

হার্বার্টের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তার বিশ্লেষণ করে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

- শিক্ষার্থীর মনের প্রকৃতিকে জানতে হবে।
- শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে।
- আগ্রহ জাগাতে হলে মনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতামণ্ডলীর সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নৈতিক চরিত্র গঠন।
- শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- অনুবন্ধ প্রণালীতে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় উপস্থাপন করতে হবে।
- উপযুক্ত ও পরিকল্পিত শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে (পঞ্চসোপান পদ্ধতি) শিক্ষাদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ⓚ বৃত্তায়িত করুন)

১. পেস্তালৎসী শিশুর শিক্ষাকে কোন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন?
- ক. প্রকৃতি বিজ্ঞান
- খ. শিক্ষা বিজ্ঞান
- গ. মনোবিজ্ঞান
- ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পেস্তালৎসী কিসের উপর বেশি জোর দিয়েছেন?
- ক. বই পড়া
- খ. মুখস্থ করা
- গ. লেখার অনুশীলন
- ঘ. বাস্তব কাজ

৩. হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ক বইটির নাম কী?
- ক. The Education of Man
- খ. On Education
- গ. The Science of Education
- ঘ. Education and Society

৪. শিশুকে শেখার প্রতি আগ্রহী করার জন্য হার্বার্ট কী করতে বলেছেন?
- ক. নতুন জ্ঞানকে আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন।
- খ. পুরানো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন।
- গ. শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- ঘ. নতুন পাঠটি আগে থেকে পড়ে আসতে বলা।

৫. হার্বার্টের মতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?
- ক. চরিত্র গঠন ও সদগুণ বিকাশ করা।
- খ. সুনাগরিক তৈরি করা।
- গ. সংস্কৃতিমনস্ক করা।
- ঘ. বিজ্ঞানমনস্ক করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পেস্তালৎসীর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

২. হার্বার্টের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। ক।

পাঠ - ৪

ফ্রয়েবেল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ফ্রয়েবেলের শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারবেন।
- ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ফ্রেডারিক উইল হেলস অগস্ট ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২ খ্রিঃ)

ফ্রয়েবেল শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার ক্ষেত্রে একজন পুরোধা ছিলেন। তিনি শিশুদের শিক্ষার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার নাম তিনি দিয়েছিলেন কিণ্ডারগার্টেন। যার অর্থ শিশু কানন। তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম হচেছ, দি এডুকেশন অব ম্যান।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব তিনটি নীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। যথা : উন্মেষণের তত্ত্ব, আত্মসক্রিয়তার তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের তত্ত্ব।

ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেকটি শিশুই সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সে সম্ভাবনা তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই কেবল তা বিকশিত হতে পারে। এই উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়াই হলো শিক্ষার কাজ। অর্থাৎ শিশুর আগ্রহ ও ঝোঁক, প্রবণতা ইত্যাদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে যদি সেই অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তার ভেতরের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হবে এবং সে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবে। এই বিকাশ ভাঁজ খোলার মতো একটু একটু করে হয় বা শিশুর সম্ভাবনা ফুলের পাঁপড়ির মতো ধীরে ধীরে খোলে বা উন্মেষিত হয় বলে ফ্রয়েবেল তাঁর তত্ত্বের নাম দিয়েছেন উন্মেষণের তত্ত্ব।

ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর এই বিকাশ প্রক্রিয়া যতটুকু না বাইরের প্রভাবে চলে তার চেয়ে অধিক বেশি চলে ভিতরের তাগিদেই। প্রতিটি শিশুর মন সৃজনশীল শক্তিতে পূর্ণ। এই শক্তি সবসময়ই সক্রিয়। তাই শিশু সব সময়ই কিছু না কিছু করতে চায়। অর্থাৎ শিশুর সহজাত প্রকৃতির অপরিহার্য ধর্ম হলো আত্মসক্রিয়তা। এই আত্মসক্রিয়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশুর মনে দেখা দেয়। ফ্রয়েবেলের মতে এই সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে খেলা। তাঁর কাছে শিশুর খেলা কোনো তুচ্ছ কাজ নয়। এই খেলার মাধ্যমেই শিশুর নিজেকে প্রকাশ করার তাড়না মেটে এবং সম্ভাবনাগুলোর বিকাশ হতে থাকে। সুতরাং খেলার শিক্ষামূলক দিকটা খুবই মূল্যবান। এজন্যই তিনি খেলাকে শিশুর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করেছেন। এটাই হলো ফ্রয়েবেলের আত্মসক্রিয়তার তত্ত্ব।

আমরা আমাদের চোখের সামনে যে জগৎ দেখি সেখানে জড় প্রকৃতি ও মানব জীবনে বিভিন্নতা দেখি, বহু বৈচিত্র দেখি। ফ্রয়েবেলের মতে এই বৈচিত্রের মধ্যে একটা ঐক্য আছে; জগতের বহুত্ব এক আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ। তাঁর মতে বিশ্বের

এই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একত্বকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানব অস্তিত্ব সার্থক হয়। তিনি আবার বলেছেন নিজের আত্মা বা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা একই কথা। কারণ এই এক ও অনন্য পরমসত্তার প্রকাশই আমরা প্রকৃতিতে ও মানবজীবনে লক্ষ্য করি। সুতরাং নিজের সম্বন্ধে উপলব্ধি পরিষ্কার হলেই পরমাত্মার বা ঈশ্বরের উপলব্ধি হবে। তাই তাঁর মতে আত্মোপলব্ধিই শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বলেছেন প্রকৃতিকে চেনা বা প্রকৃতিবীক্ষণ করা শিশুর জীবন বিকাশে অপরিহার্য। কারণ প্রকৃতিই শিশুর কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে। প্রকৃতি যে এক বিরাট ঐক্য ও নিয়মের রাজ্য এটা বুঝতে পারলে শিশু তার মানসিক জীবনেও ঐক্য আনতে পারবে বলেই ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

ফ্রয়েবেল শিক্ষাক্রমকে সুচিন্তিত ও বিস্তারিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষাক্রমে গণিত, ভাষা, প্রকৃতি পাঠ, ছবি আঁকা, মাটির কাজ, শারীরিক পরিশ্রম, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গান, নাচ, খেলা, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করে বিশ্ব জগতের পরিপূর্ণ ঐক্যরূপ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করতে হবে।

শিক্ষার পদ্ধতি

ফ্রয়েবেলের মতে বিদ্যালয় হলো বাগানের মতো, শিশুরা সেই বাগানের চারাগাছ এবং শিক্ষক মালীর মতো। শিক্ষাদানের অর্থই হচ্ছে মালীর মতো যত্ন করে শিশুরূপ চারাগাছটিকে বড় হতে সাহায্য করা। ফ্রয়েবেল তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয়টির নাম দিয়েছিলেন কিণ্ডারগার্টেন যার অর্থ শিশুকানন। তাই তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিটির নাম হয়েছে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি। শিশুরা সব সময়ই কিছু না কিছু জানতে চায়। কিছু না কিছু করতে চায়। শিশুর এই জানার আগ্রহ ও কাজ করার স্পৃহাকে ভিত্তি করেই ফ্রয়েবেল গড়ে তুলেছেন তাঁর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খেলার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খেলার ছলেই তিনি মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে গান, ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে গণিত, ভাষা, প্রকৃতিপাঠ ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই মূর্ত বস্তুগুলো ছিল দুই রকমের – 'উপহার' ও 'কাজ'। উপহারের মধ্যে ছিল উলের বল, কাঠের ঘনাকৃতি বা বেলনাকৃতি বস্তু, লাঠি, রিং ইত্যাদি। কাজগুলো ছিল মাটি, কাঠ, কার্ডবোর্ড, রঙ তুলি ইত্যাদির কাজ।

সার সংক্ষেপ

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়–

- শিক্ষার লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক একত্বের উপলব্ধি।
- আত্মোপলব্ধি আসে শিশুর সম্ভাবনার বিকাশ বা উন্মেষণের মাধ্যমে।
- উন্মেষণের স্বাভাবিক মাধ্যম আত্মসক্রিয়তা এবং আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক রূপ হলো খেলা। তাই খেলা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল অসামান্য অবদান রেখেছেন। সে জন্যই তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি আজও বিশ্ব জুড়ে জনপ্রিয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. ফ্রয়েবেল কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. ১৮৭২
   খ. ১৭৮২
   গ. ১৭৮৬
   ঘ. ১৬৯২

২. নিম্নের কোনটি ফ্রয়েবেলের লিখিত গ্রন্থ?
   ক. দ্যা সায়েন্স অব এডুকেশন
   খ. রিপাবলিক
   গ. দি এডুকেশন অব ম্যান
   ঘ. এমিল

৩. ফ্রয়েবেলের শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বটির নাম কী?
   ক. আগ্রহের তত্ত্ব
   খ. অনুসঙ্গের তত্ত্ব
   গ. উন্মেষণের তত্ত্ব
   ঘ. নৈকট্যের তত্ত্ব

৪. ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
   ক. চরিত্র গঠন করা
   খ. আত্মোপলব্ধি করা
   গ. সুনাগরিক তৈরি করা
   ঘ. নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উন্মেষণ তত্ত্বটি বুঝিয়ে লিখুন।
২. ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।খ, ২।গ, ৩।গ, ৪।খ।

পাঠ - ৫

ডিউই ও হোয়াইটহেড

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ডিউইর কয়েকটি বইয়ের নাম বলতে পারবেন।
- ডিউইর শিক্ষা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হোয়াইটহেডের জীবনের কিছু কথা বলতে পারবেন।
- হোয়াইটহেডের শিক্ষানীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রিঃ)

জন ডিউই ১৮৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভরঘন্টের বামিংটন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ শহরের বিদ্যালয়ে কলেজ শিক্ষা সেরে দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য হপকিনম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান পদ লাভ করেন। এই খাতে তিনি ১৮৯৬ সালে তার প্রশিক্ষণমূলক ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দর্শন ও শিক্ষা বিষয়ে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ডিউই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম হলো, ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড এডুকেশন, স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি, দি চাইল্ড অ্যাণ্ড দি কারিকুলাম, স্কুলস অফ টুমরো।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

ডিউইর মতে জগতের কোনো কিছুই স্থির নয়। সমস্ত অস্তিত্বশীল বস্তুই পরিবর্তনশীল, সমস্ত কিছুই প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, বাড়ছে, ক্ষয় হচ্ছে, নতুন হচ্ছে। এই রকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানুষের জীবনের বিকাশ ঘটে। বিকাশের এই প্রক্রিয়াটি সারা জীবন ধরেই চলমান থাকে। জীবনের ক্রমবিকাশের এই প্রক্রিয়া ও শিক্ষা ডিউইর মতে একই জিনিস। অর্থাৎ জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিক্ষা প্রক্রিয়া। শিশু বেঁচে আছে মানেই বাড়ছে, বাড়ছে মানেই বদলাচ্ছে। তার জীবনে নতুন আগ্রহ নতুন চাহিদা দেখা দিচ্ছে, পরিবেশের প্রভাবে নিত্য নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এগুলোর মোকাবেলা করাই হচ্ছে শিক্ষা লাভ করা। সুতরাং জীবনের ক্রমবিকাশ আর শিক্ষা লাভ একই কথা।

নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় পুরানো অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। তখন প্রয়োজন হয় সে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস বা পুনর্সৃজন করার। তাই ডিউইর মতে শিক্ষার অর্থই হলো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন পুনর্সৃজনের প্রক্রিয়া। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করেই উন্নততরভাবে সমস্যার সমাধান করি। এভাবেই সম্ভব হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতি।

সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে। সমাজের পরিবেশ ছাড়া আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি না। সামাজিক পটভূমিতেই শিশুর দৈহিক ও মানসিক চাহিদা মেটে, বহুমুখী সমস্যার সমাধান হয় অর্থাৎ শিক্ষা হয়। তাই ডিউই শিক্ষাকে

সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন এবং বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলেছেন।

শিক্ষার্থীকে আদর্শ সামাজিক পরিবেশ দিতে পারলে শিশুর শিক্ষা পূর্ণ হবে। ডিউইর মতে একমাত্র গণতন্ত্রই শিক্ষার্থীকে দিতে পারে আদর্শ সামাজিক পরিবেশ।

সুতরাং ডিউইর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আরো শিক্ষা লাভ করা। ডিউইর মতে শিক্ষার কোনো স্থায়ী লক্ষ্য থাকবে না। শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবনের সমস্যার সমাধান করার যোগ্য করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার পদ্ধতি

ডিউই তাঁর শিক্ষা পদ্ধতির নাম দিয়েছেন সমস্যামূলক পদ্ধতি। তাঁর মতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কাজ করে শিখবে। তারা নিজেদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী কোনো কাজ নির্বাচন করবে। এই কাজ করতে গিয়ে যখন সে সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তখন সে তার সমাধানের কথা চিন্তা করবে। এই চিন্তার আলোকে সে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সেগুলোকে সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাবে। এইভাবে যখন সে সমস্যার সামধান করতে পারবে তখন সেই জ্ঞান সে সমধর্মী অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করবে। এই পদ্ধতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর নির্ভর করবে। তবে প্রতিটি স্তরেই শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

ডিউইর মতে শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট থাকবে না। শিক্ষার্থীরা আগ্রহ, প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাক্রম রচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কেবল প্রয়োজনমতো নির্দেশনা দেবেন যাতে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, চাহিদা, জীবন ঘনিষ্ঠতা ও সমাজের প্রয়োজনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রণিধাণযোগ্য সেগুলো হলো :

- শিক্ষা ব্যক্তির ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সমার্থক, নিছক তথ্যসংগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন নয়।
- শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্সৃজনের প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।
- বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে।
- শিক্ষার লক্ষ্য আরো শিক্ষা অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করার যোগ্য করাই শিক্ষার লক্ষ্য।
- শিক্ষা পুরোপুরি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজের সমস্যার সমাধান করে শিখবে।
- শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট থাকবে না। শিক্ষার্থীর সমস্যা বা আগ্রহ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭ খ্রিঃ)

হোয়াইটহেড গণিত ও দর্শন বিষয়ে পাণ্ডিত ছিলেন এবং কেমব্রিজ ও হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর দুটো উল্লেখযোগ্য বই হলো প্রিন্সিপিয়া ম্যাথম্যাটিকা ও এইমস অফ এডুকেশন অ্যাণ্ড আদার এসেজ।

হোয়াইটহেডের মতে শিক্ষা হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করার কলা বা নৈপূণ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সংস্কৃতিবান ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তি তৈরি করা। তিনি বিশ্বাস

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

করতেন যে সমাজের উপকার সাধন করতে পারেন সেই ব্যক্তি যিনি একাধারে সংস্কৃতিবান এবং কোনো একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। সংস্কৃতিবান বলতে তিনি কিছু বিশেষ গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতিবান তিনিই যাঁর রয়েছে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা ও অভ্যাস সৌন্দর্যগ্রাহী মন আর দয়ার্দ্র মানবীয় অনুভূতি। হোয়াইডহেড বলেন এই ধরনের মানুষ তৈরি করতে হলে শিক্ষাক্রম থেকে নিষ্ক্রিয় ধারণাগুলো বাদ দিতে হবে। তাঁর মতে নিষ্ক্রিয় ধারণা হচ্ছে শিক্ষাক্রমের সেই সব বিষয় বা বিষয়াংশ যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না।

শিশুর বুদ্ধি বিকাশের ধারাকে তিনি তিনটি স্তরে ভাগ করছেন– রোমাঞ্চের স্তর, যথার্থতার স্তর ও সাধারণী স্তর। রোমাঞ্চের স্তর হলো অজানাকে জানার কৌতুহল, যথার্থতার স্তর হলো বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানের পরিশীলন এবং সাধারণী স্তর হলো আগের দুটি স্তরে উদ্ভুত সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধানের সাধারণ সূত্র তৈরিকরণ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

হোয়াইটহেড সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, শিল্পকলা ও ধর্মকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। তিনি সব শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষাক্রমের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাক্রমের তিনটি অঙ্গ আছে। সেগুলো হচ্ছে– সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়। এই তিনটির প্রত্যেকটি ধারাতেই অবশ্য অন্য দুটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার পদ্ধতি

হোয়াইটহেড পুস্তককেন্দ্রিক নিষ্ক্রিয় পঠন পাঠনের পরিবর্তে সক্রিয় বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতির শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার কথাও বলেছেন। পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল, ‘ বেশি বিষয় শেখাবেন না, যা শেখাবেন ভালোভাবে শেখাবেন।’ অর্থাৎ এমনভাবে শেখাতে হবে যাতে শিশু তা শেখার পরই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। তিনি এমনভাবে শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন যাতে শিক্ষার শুরু থেকেই শিশু আবিষ্কারের আনন্দ পেতে পারে। অর্থাৎ নিজে সক্রিয়ভাবে জানার আগ্রহ মেটাতে পারে। শিক্ষা হবে পর্যায়ক্রমিক ও ছন্দময় গতিতে। অর্থাৎ পঠন, পর্যালোচনা, পরীক্ষা, অবকাশ এই ছন্দে শিক্ষাদান চলবে।

সার সংক্ষেপ

হোয়াইটহেডের শিক্ষাতত্ত্বের সারসংক্ষেপ করলে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়–

- শিক্ষা হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের কলা বা নৈপূণ্য।
- শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সংস্কৃতিবান ও দক্ষ পেশাজীবী তৈরি করা।
- সংস্কৃতি হলো চিন্তার সক্রিয়তা ও সৌন্দর্য এবং মানবীয় অনুভূতির গ্রহিতা।
- বুদ্ধি তিনটি স্তরের মাধ্যমে বিকশিত হয় – রোমাঞ্চের স্তর, যথার্থতার স্তর ও সাধারণী স্তর।
- শিক্ষা ব্যবস্থা তিন ধরনের শিক্ষাক্রমের সমন্বয়ে পরিচালিত হবে – সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়।
- বেশি বিষয় একসাথে শেখানো উচিত নয়; যেটুকু শেখানো হবে তা ভালভাবে শেখাতে হবে।
- শিক্ষার শুরু থেকেই আবিষ্কারের আনন্দ পাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. ডিউই কোন দেশে কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. যুক্তরাজ্যে ১৮৬৯ সালে।
   খ. যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫৯ সালে।
   গ. যুক্তরাজ্যে ১৮৫৯ সালে।
   ঘ. যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯ সালে।

২. ডিউই এর মতে নিম্নের কোন কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়?
   ক. জীবনের ক্রমবিকাশ ও শিক্ষা লাভ একই কথা।
   খ. ধারাবাহিকভাবে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হচ্ছে।
   গ. সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে।
   ঘ. পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষায় প্রাধান্য থাকবে।

৩. ডিউই-এর মতে কোনটি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি?
   ক. বই পড়া।
   খ. আলোচনা করা।
   গ. বাস্তব সমস্যা সমাধান করা।
   ঘ. পর্যবেক্ষণ করা।

৪. হোয়াইটহেডের মতে শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
   ক. অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারের কৌশল
   খ. চরিত্র গঠনের কৌশল
   গ. সংস্কৃতিবান হওয়ার কৌশল
   ঘ. জ্ঞানের প্রয়োগ করার কৌশল

৫. হোয়াইটহেডের মতে শিক্ষার পদ্ধতি কোনটি?
   ক. সক্রিয় বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি
   খ. প্রজেক্ট পদ্ধতি
   গ. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি
   ঘ. পরীক্ষণ পদ্ধতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ডিউই শিশুদেরকে কীভাবে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতি? এ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
২. হোয়াইটহেডের শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। খ, ৫। ক।

পাঠ - ৬

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু তথ্য বলতে পারবেন ।
- রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির মূলকথা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- গান্ধীর জীবনের কিছু কথা বলতে পারবেন ।
- গান্ধীর শিক্ষানীতির মূলকথা বলতে পারবেন ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিঃ)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উঁচুমাপের সাহিত্যিক, কবি হিসেবে পেয়েছিলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি । কিন্তু শিক্ষা দার্শনিক হিসেবেও তাঁর মান ও প্রচেষ্টা কোনো অংশে কম ছিল না । তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন । তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতবাদ বিশেষ করে শিক্ষা, শান্তিনিকেতন, রাশিয়ার চিঠি নামক বইগুলোতে দেখা যায় ।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষার্থীর 'ভালোলাগা মন্দলাগার' উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন । তিনি প্রচলিত প্রাণহীন কৃত্রিম শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে শিশুদের জন্য এক আনন্দময় স্বচ্ছন্দ জীবনপ্রবাহ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন । এজন্য তিনি শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তার স্বাধীনতা, ভাবের স্বাধীনতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়ার ও সেই সাথে শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন । মুক্ত উদার পরিবেশেই শিশুর দেহ ও মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ হয় । তাই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রেখে শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন । এই সংযোগ শুধু ভাবের বা খেলাধুলার মাধ্যমে নয় বরং কাজের মাধ্যমেও হতে পারে । তাই পশুপাখি পালন, বাগান করা, কৃষিকাজ এগুলোকেও তিনি শিক্ষার অঙ্গ করেছেন । তিনি শিক্ষাকে আনন্দময় করার জন্য বিভিন্ন রকম খেলা, নাটকাভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদির চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন । শিক্ষার্থীকে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উপযুক্ত করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় প্রশাসনে অংশ নেবার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ সাধারণ শিক্ষার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন । তাই তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ । অর্থাৎ শিশুর মধ্যে যে শক্তি সম্ভাবনা হিসেবে সুপ্ত আছে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে । পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে তিনি শিশুর ব্যক্তিগত গুণাবলির বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগানো, সামাজিক গুণের বিকাশ এবং ধর্মীয় মনোভাব জাগানোর কথা বুঝিয়েছেন ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে সেইসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন যেগুলোর মাধ্যমে মানব সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় হতে পারে । এজন্য তিনি ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, দর্শন, পল্লী উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য সামাজিক কাজ এসব কিছুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন । তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার করেছেন ।

শিক্ষার পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির কথা বলেন নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শেখার কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে যে পদ্ধতিই হোক না কেন কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তা প্রয়োগ করার কথা তিনি বলেছেন। সেগুলো হলো- শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও আনন্দ, সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, শৃঙ্খলা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ। এজন্য তিনি বইপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা, হাতে কলমে কাজ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে বলেছেন।

সার সংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের সারসংক্ষেপ করলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়–

- রবীন্দ্রনাথ শিশুর ভালোলাগা, মন্দলাগা বা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
- তিনি শিক্ষায় স্বাধীনতা দান ও আনন্দ বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন।
- উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিনি শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য করেছেন।
- বিভিন্ন আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় রাখতে চেয়েছেন।
- তিনি বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদেরকে যুক্ত করেছিলেন।
- তত্ত্বীয় বিষয়ের সঙ্গে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।
- তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মনুষ্যত্বের বিকাশ।
- যে সব বিষয়ের মাধ্যমে মানব সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় হতে পারে সে সব বিষয় শিশুর শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ধারিত হবে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৫৭-১৯৪৮ খ্রিঃ)

অসাধারণ মেধা ও জ্ঞানের অধিকারী গান্ধী একজন সফল আইনজ্ঞ ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদে পরিণত হন। দেশের মঙ্গলের চিন্তা থেকেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার জন্ম হয়।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষার লক্ষ্য

গান্ধী শিক্ষাকে সামাজিক উন্নতির পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা সব মানুষের উন্নতি করবে এবং তাদেরকে মানবীয় গুণের অধিকারী করবে। তাই তিনি নতুন ধারায় শিক্ষাকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি শ্রমমুখী, জীবনমুখী ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমেই নতুন মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। এ রকম শিক্ষার মাধ্যমেই স্বনির্ভর নাগরিক গড়ে তোলা যাবে বলে তিনি মনে করতেন। গ্রামীণ ভারতের উপযোগী করে গান্ধী যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তার নাম ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা। তিনি এই শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। এর মাধ্যমে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ গঠিত হবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন।

গান্ধীর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ করা। এই প্রকাশের চরম লক্ষ্য আবার চরিত্র গঠন। তাঁর মতে বৃত্তি শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নও শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

গান্ধীর মতে শিক্ষার বিষয় শিক্ষার্থীর সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার্থীর নিজ সমাজ ও পরিবেশের ঘটনা ও বিষয় নিয়ে তৈরি হওয়া উচিত। পাঠের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকেই তিনি নির্বাচন করেছেন। গান্ধীর শিক্ষাক্রমের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে শিল্প শিক্ষা। তিনি কোনো একটা হস্তশিল্পকে শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। এতে শিক্ষার্থী শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে।

শিক্ষা পদ্ধতি

গান্ধীর শিক্ষা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো সক্রিয়তা ও অনুবন্ধ। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে কাজ করে করে শিখতে হবে এবং একটা মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো শিখতে হবে। যেমন তাঁত শিল্প যদি মূল বিষয় হয় তাহলে এই শিল্প কবে ও কোথায় শুরু হলো (ইতিহাস), কী কী কাজে লাগে (বিজ্ঞান), তুলা কোথায় কীভাবে হয় (ভূগোল), এক গজ কাপড় তৈরি করতে কত খরচ হবে (গণিত) ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখাতে হবে।

সার সংক্ষেপ

গান্ধীর শিক্ষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

- শিক্ষা হবে সামাজিক উন্নয়নের পন্থা।
- শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক।
- শিক্ষায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা বেশি গুরুত্ব পাবে।
- শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ করে তার চরিত্র গঠন।
- কোনো একটি হস্ত শিল্প হবে শিক্ষাক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়।
- সক্রিয়তাভিত্তিক অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. রবীন্দ্রনাথ কত সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন?
   ক. ১৯২১
   খ. ১৯১৯
   গ. ১৯০১
   ঘ. ১৯১০

২. রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
   ক. চরিত্র গঠন
   খ. সংস্কৃতির সংরক্ষণ
   গ. জ্ঞান অর্জন
   ঘ. মনুষ্যত্বের বিকাশ

৩. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতিতে কোনো ধারণাগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. আনন্দ
   খ. স্বাধীনতা
   গ. সৃজনশীলতা
   ঘ. উপরের সব কয়টি শুদ্ধ

৪. গান্ধীর মতে শিক্ষার লক্ষ্য কী?
   ক. ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ
   খ. ব্যক্তির মানসিক বিকাশ
   গ. ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশ
   ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

৫. গান্ধীর মতে শিক্ষা কেমন হবে?
   ক. পুস্তককেন্দ্রিক
   খ. পরীক্ষাকেন্দ্রিক
   গ. খেলাকেন্দ্রিক
   ঘ. শিল্পকেন্দ্রিক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথের মতে মনুষ্যত্বের বিকাশ করতে হলে শিশুকে কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে?

২. গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন কেন করতে চেয়েছিলেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। ঘ, ৫। ঘ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ⓚ বৃত্তায়িত করুন)

১. 'একাডেমী' কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
   ক. এরিস্টটল
   খ. সক্রেটিস
   গ. প্লেটো
   ঘ. হুক

২. রুশো প্রকৃতিকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?
   ক. জৈব প্রকৃতি
   খ. মনো প্রকৃতি
   গ. জাগতিক প্রকৃতি
   ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

৩. গান্ধীর শিক্ষা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো–
   ক. সক্রিয়তা
   খ. অনুবন্ধ
   গ. সমন্বয়
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. রুশোর শিক্ষানীতিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

২. ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. ডিউই-এর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষানীতি আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ঘ, ৩। ঘ।

ইউনিট ৩

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

ভূমিকা

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসরণ করতে হয়। এ কর্মসূচিকেই শিক্ষাক্রম বলা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম যত নির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু হবে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন তত সহজ হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কি শেখাবেন, কিভাবে শেখাবেন এবং কখন শেখাবেন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের এ তিন দিকের সাথে পরিচিত হতে পারবেন।
আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার প্রথম সোপান এবং প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষালাভ একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। এ কারণেই বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আপনারা জানবেন এবং সেই সাথে একে আরো উন্নত কিভাবে করা যায় তা পর্যালোচনা করতে পারবেন এই ইউনিট থেকে।
শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন যুগে যুগে মনীষীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে তেমনি শিক্ষাক্রম সম্বন্ধেও তাঁদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। শিক্ষাক্রম প্রণয়ণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সেই নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে শিক্ষকদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাক্রম শিক্ষকের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। এ ইউনিটে শিক্ষাক্রম এবং এর বিভিন্ন দিকের আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠের সুবিধার জন্য এ ইউনিটটিকে পাঁচটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ-১ : শিক্ষাক্রমের ধারণা
পাঠ-২ : শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা
পাঠ-৩ : শিক্ষাক্রমের প্রকারভেদ
পাঠ-৪ : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

পাঠ - ১

শিক্ষাক্রমের ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষাক্রম কী তা লিখতে পারবেন ।
- শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীদের বক্তব্য উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন ।

শিক্ষাক্রমের ধারণা

শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষা ব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড । শিক্ষার কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে। Currere শব্দের অর্থ হলে Course of Study। অনেকে মনে করেন, ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে কারিকুলাম এসেছে। এই Currere শব্দের অর্থ ঘোড়দৌড়ের পথ। অর্থাৎ শিক্ষাকে দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো শিক্ষার নির্ধারিত পথে এগিয়ে নিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। Encyclopedia Britannica তে বলা হয়েছে, শিক্ষাক্রম হলো বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালয়ে যে পাঠ্য বিষয়ে অনুশীলন করা হয় তার সমবায় মাত্র। কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষাক্রমের এ জাতীয় ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন পাঠ্য বিষয়কে শিক্ষাক্রমের একটি অংশ হিসাবে দেখা হয়। শিক্ষকের পরিচালনায় শিশুরা বিদ্যালয় এবং সমাজে যা কিছু শেখে তাই হলো শিক্ষাক্রম। অর্থাৎ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে যা কিছু শেখে তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেনী (Payne) বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যেসব কর্মসূচী বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়, তারই সমবায় হলো আধুনিক শিক্ষাক্রম।" তাঁর এ মতবাদটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতীক এবং সামাজিকভাবে বিকাশের প্রক্রিয়া। তাহলে দেখুন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ও সমাজে শিক্ষকের পরিচালনায় যা শেখে তাই শিক্ষাক্রম। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে যে কার্যক্রম চলে তার নির্দেশনা থাকে শিক্ষাক্রমে। এভাবে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে যেমন – খেলাধুলার মাঠে, গবেষণাগারে, পাঠাগারে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সংস্পর্শে প্রয়োজনীয় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা শিক্ষাক্রমের আওতাভূক্ত।

শিক্ষাক্রম কি

শিক্ষাক্রমের কয়েকটি সাধারণ সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো এসব থেকে শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়।

- নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ও জীবনকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয় যে কর্মতৎপরতা ও অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করে তার সমষ্টি হলো শিক্ষাক্রম।

- একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত একটি সমন্বিত শিক্ষাদান কার্যাবলী, পঠন উপাদান ও শিখন অভিজ্ঞতার সমাহারই শিক্ষাক্রম।
- শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যথাযথ শিখন অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সুবিন্যস্ত কর্মকাণ্ডকে শিক্ষাক্রম বলা হয়।
- বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অর্জন এবং তার স্বীকৃতি ও স্বরূপকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রম বলে।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কতিপয় মনীষীর বক্তব্য

রালপ টাইলাই শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা সরাসরি না দিয়ে এর উপর চারটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। যেমন-

শিক্ষার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়?

কোন শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় এ উদ্দেশ্য অর্জন করবে?

এসব শিখন অভিজ্ঞতা কী উপায়ে সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে?

উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা কীভাবে যাচাই করা যাবে?

লক্ষ্য করুন, প্রশ্নগুলো থেকে একটি শিক্ষাক্রম – উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠন ও বিন্যাস এবং শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া – এ চারটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবার হুইলার বলেন, একটি বৃত্তাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদি উপাদানসমূহের সাংগঠনিক রূপকে শিক্ষাক্রম বলে। (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)

জন কার এর মতে, বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম।

চিত্র-১

ওচস এর মতে শিক্ষাক্রম হলো ঃ

- কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরের জন্য কেবল একটি বিষয়ের জন্য একটি কার্যক্রম ।
- কোনো একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা স্তরের জন্য বহু বিষয়ের একটি কার্যক্রম ।

লেভির মতে, বর্তমানে শিক্ষাক্রম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সংযোজিত হচ্ছে শিক্ষার্থীর তৎপরতা, নানা রকম শিখন শেখানো সামগ্রী, শিক্ষাদানের কলা কৌশল, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি ।

শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য

শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের জন্য বিষয়বস্তু ও কর্ম অভিজ্ঞতার যে মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়, তাকে শিক্ষাক্রম বলে। কোনো একটি শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোনো কোনো বিষয় দেখানো হবে সেটি উল্লেখ থাকে শিক্ষাক্রমে এবং বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এবং সীমারেখা থাকে পাঠ্যসূচিতে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের বা শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কি পরিমাণ কর্ম অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু তার শিখতে হবে পাঠ্যসূচিতে তার বিবরণ থাকে ।

যেমন ধরুন, মাতৃভাষা বা গণিত বা ধর্ম বিষয়ের কতটুকু বিষয়বস্তু তারা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শিখবে এটি আমরা পাব পাঠ্যসূচিতে। অর্থাৎ, শিক্ষাক্রমের উল্লেখিত প্রতি শ্রেণীতে যে বিষয় দেওয়া আছে তার প্রত্যেকটির বিবরণ দেওয়া থাকে পাঠ্যসূচিতে। একটা কথা আপনারা এখানে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, তাহলো শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার বৌদ্ধিক মান এবং চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে তার আরও বিকাশের জন্য যে পরিমাণ বিষয়বস্তু প্রয়োজন তারই বিবরণ বহন করে পাঠ্যসূচি। এ কারণে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার সময় গভীরভাবে ভাবতে হয় যে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের শিশুর পক্ষে কতটা শেখা সম্ভব এবং এই বয়সের শিশুর ভিতরের শক্তির বিকাশের জন্য কতটুকু দক্ষতা অর্জন তাকে করতে হবে ।

তাহলে কোনো একটি শিক্ষা স্তরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে যে বিষয়সমূহ প্রণয়ন করা হয় তাহলো শিক্ষাক্রম ।

শিক্ষাক্রমকে অনুসরণ করে নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সীমারেখা ও গভীরতা উল্লেখ করা থাকে পাঠ্যসূচিতে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রণীত একটি সমন্বিত শিক্ষাদান কার্যাবলী, পঠন উপাদান ও শিখন অভিজ্ঞতাকে কী বলা হয়?
   - ক. পাঠ্যসূচি
   - খ. বিষয়বস্তু
   - গ. শিক্ষাক্রম
   - ঘ. বিষয়সূচি

২. "শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন মূল্যায়ন এ পাঁচটি কাজের বৃত্তাকার প্রক্রিয়াই শিক্ষাক্রম"– এই সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
   - ক. রালপ টাইলার
   - খ. ওচস
   - গ. পেনী
   - ঘ. হুইলার

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের দুটি সংজ্ঞা লিখুন।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য নিরূপণ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ঘ।

পাঠ - ২

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সার্থক শিক্ষাক্রম রচনার জন্য যে সকল মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন তা নিচে দেয়া হলো ঃ

শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা হবে ব্যাপক

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিশুর নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টিই হলো প্রকৃত শিক্ষাক্রম। শিশু শ্রেণীকক্ষে যা শেখে কেবলমাত্র সেগুলো শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। বরং শিক্ষাক্রমের উপাদান ছড়িয়ে আছে খেলার মাঠে, লাইব্রেরীতে, গবেষণাগারে, বনভোজন ইত্যাদিতে। এ সকল জায়গায় কাজ করতে যেয়ে শিশুরা পরস্পরের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে তার সবটুকুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময়ে এই ব্যাপক পরিসরের কথা সকলকে অবহিত হতে হবে।

মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিশুর বিকাশের স্তর ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে। তবেই শিক্ষাক্রম মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে।

সমাজবিজ্ঞানসম্মত হবে

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশুকে সমাজে বাস করার উপযোগী করে গড়ে তোলা। শিশু সামাজিক জীব, ভবিষ্যতে তাকে সমাজে বাস করতে হবে। শিক্ষাক্রম এমন হবে যেন শিশু সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। অতএব, সমাজ বিজ্ঞান সম্মত হবে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি থাকবে

রুচি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্র, নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সে অন্যের সাথে অতুলনীয়। জন্মগত গুণাবলীর দিক থেকে এক শিশু অন্য শিশু হতে পৃথক। তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং শিক্ষাক্রম রচনার সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এ নীতির কথা মনে রাখতে হবে।

ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের সমন্বয় থাকবে

শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ হবে। অপরদিকে শিশুকে সমাজের চাহিদা পূরণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সুতরাং শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়।

বহুমুখী হবে

শিক্ষাক্রমে বিভিন্নধর্মী ও বৈচিত্রময় পঠনীয় বস্তুর সমাবেশ থাকতে হবে যেন প্রতিটি শিশু তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, নিজস্ব রুচি ও আগ্রহ অনুসারে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এজন্য শিক্ষাক্রমে বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কর্মকেন্দ্রিক হবে

শিক্ষাক্রম এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিশু কাজ করার প্রচুর সুযোগ পায়। কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাই বাস্তব শিক্ষা। কাজের সুযোগ না থাকলে শিশুর শিক্ষা পুঁথিসর্বস্ব হয়ে পড়বে। আধুনিককালের শিক্ষাবিদদের মতে শিশুর শিক্ষা সার্থক করে তুলতে হলে তাকে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং খেলাধুলা, ব্যায়াম, সৃজনমূলক কাজ, সমাজ সেবামূলক কর্মসূচীর স্থান শিক্ষাক্রমে থাকবে।

জীবনকেন্দ্রিক হবে

শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রম রচিত হবে। জীবন বলতে শিশুর পূর্ব পুরুষদের অতীত জীবন, তার বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যত জীবন – এ তিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচিত হবে। এর কোনোটিকে বাদ দিলে শিশুর বিকাশ পূর্ণতা লাভ করবে না। সুতরাং তার অতীতকে জানা, বর্তমান স্বত্তার বিকাশ লাভ ও ভবিষ্যত জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সমাবেশ থাকবে শিক্ষাক্রমে।

পেশা গ্রহণের জন্য প্রস্তুতির সুযোগ থাকবে

প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাজীবন শেষে একটি পেশা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাক্রম শিশুকে তার ভবিষ্যত পেশার সাথে পরিচয় ঘটাবে। যদিও পেশার যোগ্যতা অর্জনের পৃথক শিক্ষাক্রম প্রয়োজন, তবুও সাধারণ শিক্ষাক্রমে পেশা সম্পর্কে কিছু আভাস থাকতে হবে যেন শিশু নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক পেশা নির্বাচনের দিক নির্দেশ পায়।

জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন থাকবে

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিশুকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। কাজেই শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশু এর মাধ্যমে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি আস্থাবান হয়ে গড়ে ওঠে।

অবসর যাপনের শিক্ষা দেবে

গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে অবসর সময় যাপন করার শিক্ষা আধুনিক শিক্ষাক্রমে থাকতে হবে। অবসর সময় কাটানো প্রকৃতপক্ষে একটা সমস্যা। অনেক সময় মানুষ অর্থহীন ও ক্ষতিকর কাজ করে অবসর সময় অতিবাহিত করে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য এটা অনিষ্টকর। এজন্য কিভাবে অবসর সময় যাপন করা যায় তার নির্দেশনা থাকতে হবে আধুনিক শিক্ষাক্রমে।

পরিবর্তনশীল হবে

শিক্ষাক্রম চিরস্থায়ী হতে পারে না। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাক্রম সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিশুর জন্য শিক্ষাক্রম, শিক্ষাক্রমের জন্য শিশু নয়। সুতরাং শিশুর প্রয়োজন ও চাহিদার পরিবর্তন হলে সে চাহিদা পূরণ করার মত পরিবর্তন শিক্ষাক্রমে আনতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষাক্রম যে নীতিতে প্রণীত হবে–
   ক. বিষয়কেন্দ্রিক
   খ. বিজ্ঞানকেন্দ্রিক
   গ. শিক্ষাকেন্দ্রিক
   ঘ. কর্মকেন্দ্রিক

২. নিচের কোনটি শিক্ষাক্রমের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. জীবনকেন্দ্রিক হবে
   খ. মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে
   গ. সংস্কৃতিকেন্দ্রিক হবে
   ঘ. সমাজবিজ্ঞানসম্মত হবে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রধান চারটি নীতি উল্লেখ করুন।

২. শিক্ষাক্রম পরিবর্তনশীল হওয়ার কারণ কী?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ।

পাঠ - ৩

শিক্ষাক্রমের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষাক্রম কত প্রকার ও কি কি বলতে পারবেন ।
- বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাক্রম বর্ণনা করতে পারবেন ।

প্রকার

যুগের পরির্বনের সাথে সাথে সমাজের চাহিদা পরিবর্তন হয়। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার আদর্শ ও চাহিদার পরিবর্তন হয় এবং সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয় । আবার এর সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় । এই কারণেই অতীতে যে শিক্ষাক্রম ছিল বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী তার পরিবর্তন হয়েছে । অনেক নতুন ভাবধারার উদয় হয়েছে যা শিক্ষাক্রমকে করে তুলেছে আধুনিক ও যুগোপযোগী । এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা শিক্ষাক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করেছি ।

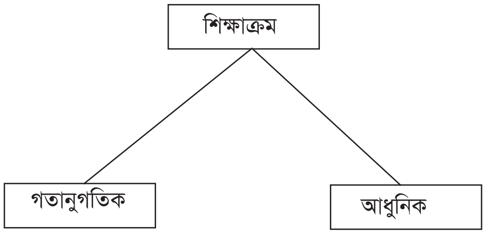

প্রাচীনকালে মনে করা হ'ত কতগুলো বিষয় আছে যা ব্যক্তির সুপ্ত গুণাবলী বিকাশে সহায়ক । ব্যক্তির এসব গুণাবলীর বিকাশকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করা হত । এ কারণে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে গতানুগতিক ধারায় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হত ।

কিন্তু আধুনিককালে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, ক্ষমতা, চাহিদা, প্রয়োজন এসবকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তার উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হত। তাই আধুনিককালের শিক্ষাক্রমের পদ্ধতি ভিন্নরূপ ।

এখানে লক্ষ্য করুন অতীত যুগে শিক্ষাক্রম ছিল বিষয়ভিত্তিক এবং একালের শিক্ষাক্রম হয়েছে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক । আধুনিক শিক্ষাক্রমকে আরো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ।

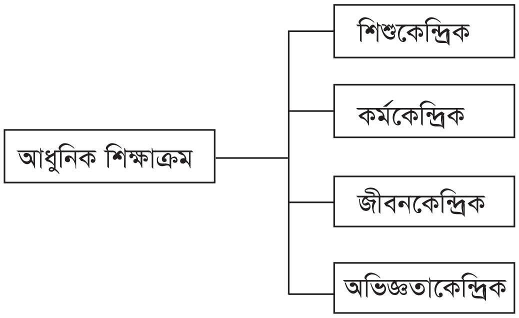

গতানুগতিক বা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম

গতানুগতিক বা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, চাহিদা, বয়স, আগ্রহ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ শিক্ষাক্রমে কি কি বিষয় শিক্ষার্থীকে শেখানো হবে তার উপর নির্ভর করে শিক্ষাক্রম রচনা করা হয়। এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন কি না, সমাজের ও শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাবে কি না অথবা বিষয়গুলো শিখবার বৌদ্ধিক ও মানসিক অবস্থা শিক্ষার্থীর আছে কি না তা যাচাই করা হত না। ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার শিক্ষা সম্পূর্ণ হত না এবং তা সমাজের প্রয়োজনও মেটাতে পারতো না। সে কারণে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে আধুনিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়।

আধুনিক শিক্ষাক্রম

১. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম

শিশুর বয়স, আগ্রহ, ক্ষমতা, মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় তাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম বলা হয়। একটি শ্রেণীতে একই বয়সের শিশুর শিক্ষালাভ করে এবং এই এক শ্রেণীর শিশুর ক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, আগ্রহ, ঝোঁক মোটামুটি এক ধরনের হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবেই। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই ব্যতিক্রম বা স্বাতন্ত্র্যকে বুঝবেন এবং জানবেন। আবার শিশুর সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং তাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করাও শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেও বিষয় নির্বাচন করে শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। তাই এখানে বিষয়বস্তু গৌণ, শিশুর চাহিদাই মুখ্য।

২. কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম

শিশুরা সাধারণত চঞ্চল প্রকৃতির হয়। সব সময়ই কিছু না কিছু করতে চায়। চুপ করে বসে কথা শোনা বা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা তার পক্ষে সম্ভব না। এ কারণে শিশুকে কিছু শেখাতে হলে যদি তা কোনো কিছু করতে দিয়ে শেখানো যায় তবে সে আগ্রহের সাথে শেখে। কাজের মধ্য দিয়ে শেখানোর ব্যবস্থা থাকে বলে এ শিক্ষাক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম বলে। কাজের মধ্য দিয়ে বা খেলার মধ্য দিয়ে শিশু শেখে বলে শিশু তার নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী শিখতে পারে। কাজে তার আগ্রহ তৈরি হয়, দক্ষতা বাড়ে এবং সৃজনীশক্তির প্রকাশ হয়। শিশু তার কাজের প্রতিটি স্তরে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে ফলে তার শিক্ষা হয় পরিপূর্ণ।

তাহলে এবার কি আমরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারব? আসুন চেষ্টা করি, যে শিক্ষাক্রমে শিশুকে সক্রিয় বলে বিবেচনা করা হয় এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে শেখাবার ব্যবস্থা করে তাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম বলা হয়।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডিউই বলেছেন, সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা হয়।

৩. জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম

সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপন করার জন্যই শিশুর শিক্ষা। যে সমাজে শিশু বাস করছে, তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে যাতে শিশু চলতে পারে সে জন্য তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিশু শিক্ষার মাধ্যমে সে যোগ্যতা অর্জন করবে। শিক্ষাই তাকে উন্নত জীবন ও সমাজ গড়ে তুলতে শিখাবে। তাই শিক্ষাক্রম হবে জীবনকেন্দ্রিক।

৪. অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম

ডিউই বলেছেন, শিক্ষা হলো পুরানো অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নতুন অভিজ্ঞতা পুনর্গঠন। শিশু নতুন কিছু শেখার সময় তার পুরানো অভিজ্ঞতার আলোকে শিখবে। যা কিছু এতদিন সে জেনে এসেছে, শিখে এসেছে তার ভালমন্দ, পুরানো ও নতুন দিক সম্বন্ধে পরিচিত হবে।

আগে শিশু যা কিছু জেনেছে তার সাথে যদি আজকের জানার বিষয়ে কোনো যোগাযোগ না থাকে তবে শিক্ষা হয়ে যায় অবাস্তব। জীবনের সাথে, বাস্তবতার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক না থাকলে সে শিক্ষা কি কোনো কাজে লাগে? অবশ্যই না। তাই শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তোলার জন্য শিশুর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তার চারপাশের থেকে উপাদান নিয়ে শিক্ষাক্রম রচনা করতে হবে। এভাবে অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম তৈরি হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, শিশুর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষাক্রম রচনা করা হয় তাকে অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. আধুনিক কালে শিক্ষাক্রম হচ্ছে–
 ক. গতানুগতিক
 খ. বিষয়কেন্দ্রিক
 গ. মনোবিজ্ঞানসম্মত
 ঘ. জ্ঞানকেন্দ্রিক

২. শিশুর সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশের জন্য কোন ধরনের শিক্ষাক্রম বিশেষ উপযোগী?
 ক. শিশুকেন্দ্রিক
 খ. জীবনকেন্দ্রিক
 গ. কর্মকেন্দ্রিক
 ঘ. বিষয়কেন্দ্রিক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম কত প্রকার ও কী কী?

২. শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক।

পাঠ - ৪

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যোগ্যতা ও প্রান্তিক যোগ্যতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবশ্যকীয় শিখনক্রমের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কাঠামো শনাক্ত করতে পারবেন।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। এদিক থেকে শিশুর সর্বাঙ্গিন বিকাশের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য চাই যথাযথ জনশক্তি। এই জনশক্তি সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হলো শিক্ষা। শিক্ষার ভিত্তিস্তর হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের জন্য সমান সুযোগ করে তোলা এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। সে কারণে আমরা আশা করি প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকে এমন যোগ্যতা দেবে যে সে আগামী দিনের সুখী মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। জীবনের মুখোমুখি হওয়ার মত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সে অর্জন করবে।

তাই শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদানকে উদ্দেশ্য করে ১৯৯১ সাল থেকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়।

যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম কী?

আগামী দিনের নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এদেশের সকল শিশুর জন্য যে সব যোগ্যতা একান্ত প্রয়োজন সেগুলো অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম রচনা করা হয়েছে। এ যোগ্যতা বলতে সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হার বৃদ্ধি, ঝড়ে পড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্যই এ যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রচলন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশু সমাজ, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়, তা হলো–

- আমাদের দেশের সীমিত সুযোগের মধ্যে যতটুকু যোগ্যতা শিক্ষার্থী অর্জন করে ভবিষ্যতে যোগ্য নাগরিক হয়ে সুখী জীবন যাপন করতে পারবে তা চিহ্নিত করা হয়।
- যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে কোনো কোনো বিষয়ের পঠন পাঠন প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা হয়।
- কোনো শ্রেণীতে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তা ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

- প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলোকে পৃথকভাবে বাছাই করে একটি তালিকা তৈরি করা হয়।
- প্রত্যেক বিষয় ও বিষয়বস্তুকে যোগ্যতাগুলোর বিন্যাস সুষম হয়েছে কি না এবং তা শিক্ষার্থীর বয়স, প্রবণতা, ক্ষমতা ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা দেখা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতা কী?

ধরুন, "বাংলা বিষয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুদ্ধভাবে ও স্পষ্ট স্বরে কথা বলতে পারবে।" এ দক্ষতা শ্রেণীতে আয়ত্ব করার পর শিশু যদি তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শুদ্ধ ভাষায় ও স্পষ্ট স্বরে কথা বলতে পারে তবে সেটি হবে তার যোগ্যতা।

আবার গণিত বিষয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ১০০ পর্যন্ত গণনা শেখার পর একজন শিশু তার বাড়ির পরিবেশে বা বাজারে ১০০টি পান/সুপারি/মরিচের চারা বা টাকা নির্ভুলভাবে গুণতে পারলে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গুণতে পারার যোগ্যতা সে অর্জন করেছে বলে ধরা হবে।

সুতরাং কোনো বিষয় পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী কোনো জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত্ব করার পর শিশু তার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারলে সে জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা যায়।

এখানে লক্ষ্য করুন, যে কোনো যোগ্যতা অর্জনের কাজ শুরু হয় প্রথম শ্রেণী থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় অন্য রকমও হতে পারে।

পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জণ করবে বলে আশা করা হয় সেগুলোই প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের এ প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ আছে বলে এ স্তরের শিক্ষাকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা বলা হয়।

সুতরাং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিকে প্রান্তিক যোগ্যতা বলে।

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

কোনো একটি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রান্তিক যোগ্যতা শুরু করার শ্রেণী থেকে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ঐ যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রমবিন্যাসকে শিখনক্রম বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুর সামর্থ ও চাহিদার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে অতি প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় যোগ্যতাগুলো ১১টি বিষয়ের শিখনক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তরের সকল শিশুই এ শিখনক্রম আয়ত্ত্ব করার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে। এজন্য শিখনক্রমগুলোকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম (Essential learning continua) বলা হয়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

আবশ্যকীয় শিখনক্রমের অন্তর্ভুক্ত ১১টি বিষয় হলোঃ

- বাংলা (মাতৃভাষা)
- গণিত
- পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান)
- ইংরেজি
- ইসলাম ধর্ম
- হিন্দু ধর্ম
- বৌদ্ধ ধর্ম
- খ্রীষ্ট ধর্ম
- শারীরিক শিক্ষা
- চারু ও কারু কলা
- সঙ্গীত

শিক্ষাক্রমের কাঠামো

আপনাদের সুবিধার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে সুপারিশকৃত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের কাঠামো ও বিভিন্ন বিষয়ের সাপ্তাহিক সময় বন্টন নিচে দেওয়া হলো ঃ

ক্রম	বিষয়	পিরিয়ডের সংখ্যা	সময়ের পরিমাণ (ঘন্টা)	সময়ের হার%	পিরিয়ডের সংখ্যা	সময়ের পরিমাণ (ঘন্টা)	সময়ের হার%	মন্তব্য
১	মাতৃভাষা	১০	৫.০০	৩৩.৩৩	৭	৪.০৮	২০.৬৪	
২	গণিত	৬	৩.০০	২০.০০	৬	৩.৫০	১৭.৭১	
৩	পরিবেশ পরিচিতি	৫	২.৫০	১৬.৬৭	৬	৩.৫০	১৭.৭১	
৪	ধর্মশিক্ষা	৩	১.৫০	১০.০০	৩	১.৭৫	৮.৮৬	
৫	শারীরিক শিক্ষা	৩	১.৫০	১০.০০	৩	১.৭৫	৮.৮৬	
৬	চারু ও কারুকলা				২	১.১৭	৫.৯০	
৭	সঙ্গীত	৩	১.৫০	১০.০০	২	১.১৭	৫.৯০	
৮	ইংরেজি				৫	২.৯২	১৪.৪২	
		মোট	৩০	১৫.০০	১০০.০০	১৯.৮৪	১০০.০০	

ক) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে প্রতি পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য । ৩০ মিনিট হিসেবে সাপ্তাহিক কার্যকাল ১৫ ঘন্টা এবং দৈনিক গড় কার্যকাল ২.৫ ঘন্টা । এছাড়া প্রত্যহ নাম ডাকার জন্য ৫ মিনিট থাকবে ।

খ) ৩য়-৫ম শ্রেণীর প্রতি পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ৩৫ মিনিট হিসেবে সাপ্তাহিক কার্যকাল ১৯.৮৪ ঘন্টা এবং দৈনিক গড় কার্যকাল ৩.৩৯ ঘন্টা । এছাড়া প্রত্যহ প্রথম পিরিয়ডে নাম ডাকার জন্য ৫ মিনিট থাকবে ।

গ) চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষাদান বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে ।

ঘ) শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্মসূচীর আবশ্যিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হবে ।

ঙ) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শুধুমাত্র মাতৃভাষা ও গণিতের পাঠ্যপুস্তক থাকবে ।

চ) ৩য়-৫ম শ্রেণীতে শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের কোনো পাঠ্যপুস্তক থাকবে না ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন ধরনের যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য–
   ক. বিষয়ভিত্তিক
   খ. দক্ষতাকেন্দ্রিক
   গ. সমাজভিত্তিক
   ঘ. জীবনভিত্তিক

২. প্রান্তিক যোগ্যতা হলো–
   ক. পঞ্চম শ্রেণী শেষে অর্জিত যোগ্যতা
   খ. পাঁচ বছর মেয়াদী অর্জিত যোগ্যতা
   গ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
   ঘ. শুরু থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতা

৩. কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতা শুরু করার শ্রেণী থেকে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রমবিন্যাসকে কী বলে?
   ক. প্রান্তিক যোগ্যতা
   খ. সর্বজনীন শিক্ষা
   গ. শিখনক্রম
   ঘ. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলতে কী বুঝায়?
২. যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের অর্থ কী?
৩. প্রাথমিক স্তরের যে কোনো একটি শ্রেণীর একটি বিষয়ের পাঠ্যসূচির একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। গ।

পাঠ - ৫

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বর্ণনা করতে পারবেন ।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কি তা লিখতে পারবেন ।
- শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ বর্ণনা করতে পারবেন ।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষক

একটি জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার অপরিহার্য হলো শিক্ষাক্রম । আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত । তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । যেমন :

সমাজের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্রমে কি নতুন উপাদান সংযোজন করতে হবে তা শিক্ষকরাই চিহ্নিত করতে পারবেন ।

শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও শিখন সামগ্রীগুলো শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক মনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা শিক্ষকরা বুঝতে পারেন ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে ।

শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করানোর জন্য কি ধরনের শিক্ষা উপকরণ, যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে তা শিক্ষকদের শিক্ষা সামগ্রী থেকে সঠিকভাবে জানা যাবে ।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও তার সফলতার মূলে রয়েছে শিক্ষক । এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরিবর্তিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষকদের পরিচিত করা এবং ব্যাবাহরবিধি শেখানো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন । এ উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমের সাথে পরিচিত করা ও নতুন বিষয়বস্তু শেখানোর কলাকৌশল আয়ত্ত্ব করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাকে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বলা হয়।

১৯৯২ সালে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করে। ৩০-৩৫ জনের একটি প্রশিক্ষণার্থী দল ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। থানা প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

শিক্ষকের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

ক্লাস্টার ট্রেনিং

শ্রেণী শিক্ষাদানকে উন্নত ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৮৬ সালে ক্লাস্টার ট্রেনিং শুরু করা হয। এক মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন সহকারী থানা অফিসার। কিন্তু অনেক স্কুলই এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেনি, অবশ্য মূল্যায়ন থেকে দেখা গেছে যে, ক্লাস্টার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের শ্রেণীতে শিক্ষাদানের মান উন্নত হয়েছে।

সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং

১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ৪-৫টি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ এক একবার একটি স্কুলে মিলিত হয়ে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছিল। ফলে ১৯৯৪ সাল থেকে এটি সারা দেশে চালু করা হয়। সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যে সাধারণত নিচের কার্যগুলো সম্পাদন করা হয়ঃ

- একজন শিক্ষক প্রথমে একটি পাঠ উপস্থাপন করেন। এর উপর পরে আলোচনা হয়।
- শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- শিক্ষকগণ সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবহারিক কাজ প্রদর্শন করেন।
- শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা ও শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কর্মসূচী কখন গ্রহণ করা হয়?
   - ক. ১৯৯৫ সালে
   - খ. ১৯৯০ সালে
   - গ. ১৯৯২ সালে
   - ঘ. ১৯৮২ সালে

২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি?
   - ক. নতুন বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতি
   - খ. শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিকের সাথে পরিচিতি
   - গ. শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে পরিচিতি
   - ঘ. শিক্ষাক্রম উপকরণ ব্যবহার কৌশল জানা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকরা কী ভূমিকা পালন করতে পারেন?

২. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

৩. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর কার্যাবলী লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. আধুনিক কালে শিক্ষাক্রম হচ্ছে−
   ক. গতানুগতিক
   খ. বিষয়কেন্দ্রিক
   গ. মনোবিজ্ঞানসম্মত
   ঘ. জ্ঞানকেন্দ্রিক

২. প্রান্তিক যোগ্যতা হলো−
   ক. পঞ্চম শ্রেণী শেষে অর্জিত যোগ্যতা
   খ. পাঁচ বছর মেয়াদী অর্জিত যোগ্যতা
   গ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
   ঘ. প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতা

৩. শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের মূল কথা হলো−
   ক. শিশুকে সক্রিয় রাখা
   খ. শিশুর চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
   গ. শিশুকে সামাজিক রীতিনীতি শিখানো
   ঘ. শিশুর শিক্ষা জীবনধর্মী করা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

২. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।গ, ২।গ, ৩।খ।

ইউনিট ৪

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বৃটিশ ভারতে শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে যে-কটি শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮৫৪ সালের চার্লস উড-এর শিক্ষাপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শিক্ষাপত্রের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তৎকালীন বঙ্গদেশেও জনশিক্ষা পরিদপ্তর গঠন করা হয়। এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবী ছিল জনশিক্ষা পরিচালক (Director of Public Instruction- DPI)। এক শতাব্দীরও বেশি কাল যাবৎ এই প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে এদেশের শিক্ষা প্রশাসন চলে এসেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দশ বছর পর ১৯৮১ সালে এদেশের শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে পূর্বতন জনশিক্ষা পরিদপ্তরকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয় – (১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, (২) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও (৩) পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা পরিদপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তর : উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এছাড়া বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মূলনীতি এবং শিক্ষা প্রশাসনে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এই ইউনিটে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, মাঠ পরিকল্পনা, সাপ্তাহিক সময় তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শিক্ষা প্রশাসনের অঙ্গ। আলোচ্য ইউনিটে আমরা উক্ত বিষয়সমূহের ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

এই ইউনিটের পাঠের বিষয়বস্তুকে আমরা ৮টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করবো।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো
পাঠ-২ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মূলনীতি
পাঠ-৩ : বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা
পাঠ-৪ : বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ঃ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা এবং সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন
পাঠ-৫ : পত্র যোগাযোগ
পাঠ-৬ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা
পাঠ-৭ : ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক; অভিভাবক সমিতিঃ গঠন ও দায়িত্ব
পাঠ-৮ : রেজিস্ট্রার ও নথিপত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব, তালিকা ও সংরক্ষণের কৌশল
পাঠ-৯ : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও স্থানীয় জনগণের ভূমিকা

পাঠ - ১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিসের প্রধানের দায়িত্ব বলতে পারবেন।
- জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রধান দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন।
- স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার রয়েছে। ১৯৮১ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এরপর ১৯৯১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি, উদ্দেশ্য ও আইনসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সার্বিক কর্মকাণ্ডকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত একটি সুবিন্যস্ত শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো দেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করছে। (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
শিক্ষা সচিব
(প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
(মহাপরিচালক)

বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
(উপ-পরিচালক)

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
(জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার)

থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস
(থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার)

সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার

প্রাথমিক বিদ্যালয়
(প্রধান শিক্ষক)

চিত্র ঃ ১ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো
সূত্র ঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। জাতীয় উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই স্তরের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য বর্তমানে একজন প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের (পিএমইডি) দায়িত্বে আছেন। এই বিভাগের জন্য একজন সচিব রয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পিএমইডি এর প্রধান দায়িত্ব হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

এর পরেই রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। একজন মহাপরিচালক এই অধিদপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন। এই অধিদপ্তরে বর্তমানে মোট ৩৪০ জন জনবল বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা যেসব দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করেন তা নিম্নরূপ:

- বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের শিক্ষা অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন।

দায়িত্ব

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সম্পর্কীত নীতি নির্ধারণে ও এর বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- অধিদপ্তরের অধীনস্থ প্রশাসক, পরিদর্শক, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীগণের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সম্পৃক্ত প্রশাসন পরিচালনা ও উন্নয়ন।
- প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয় সুনিশ্চিতকরণ।

বিভাগীয়, জেলা ও থানা শিক্ষা অফিস

- বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি করে আঞ্চলিক অফিস আছে। একজন উপ-পরিচালক তাঁর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মূল দায়িত্ব হলো মন্ত্রণালয় গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা করা।
- জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসের প্রধান কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। সরকারী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসারে তিনি নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন।
- থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারী নীতি বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

- সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার তার ক্লাস্টারভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব পালন ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাজে সহায়তা করেন এবং স্থানীয় এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাদি সম্পন্ন করেন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্য পরিচালনাসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদত্ত কার্য সম্পাদন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্বে কে আছেন?
   - ক. শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
   - খ. মহাপরিচালক
   - গ. শিক্ষা সচিব
   - ঘ. বিভাগীয় উপ-পরিচালক

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ ধাপে কে রয়েছেন?
   - ক. থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
   - খ. প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক
   - গ. সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার
   - ঘ. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার

৩. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার?
   - ক. বিভাগীয় উপ-পরিচালক
   - খ. মহাপরিচালক
   - গ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ দায়িত্ব
   - ঘ. প্রতিমন্ত্রী

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যৌথ দায়িত্বগুলো লিখুন।

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি চিত্র অঙ্কন করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। গ।

পাঠ - ২

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মূলনীতি শনাক্ত করতে পারবেন ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর বিদ্যালয়ের সার্থক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ নির্ভরশীল। কাজেই বিদ্যালয়ের সমগ্র কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সার্থক হয় এবং জীবন হয় পরিপূর্ণ ।

প্রথমে আমরা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বলতে কি বুঝায় তা জানার চেষ্টা করি ।

গুরুত্ব

বিদ্যালয়ের কার্যাবলীকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ কার্যগুলো হলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট সকল প্রকারের কার্যাবলী । আর বাহ্যিক কার্যগুলো হলো ম্যানেজিং কমিটি গঠন, শিক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, শিক্ষকদের চাকুরী ও বেতন ভাতা সম্পর্কিত বিষয় সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি । এই সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে সব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয় তাকে আমরা সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বলতে পারি । বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

অপরদিকে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি সাধন এবং ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষাসহ তাদের সামগ্রিক বিকাশ, যেমন শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদির জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাই বিদ্যালয় পরিচালনা বলা যেতে পারে ।

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কতকগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য । নিচে ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

মূলনীতি

- বিদ্যালয়ের নিয়ম বিধি লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই তা অবহিত হবেন ।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট থাকবে ।
- সমষ্টিগত স্বার্থ ব্যক্তি স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাবে ।
- নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়ী থাকবেন ।
- ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতে হবে ।
- পেশাগত উন্নতির উপায় ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ।

বিদ্যালয় পরিচালনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত নীতি ও উপায়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :

মূলনীতি

- ভবন সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও প্রয়োজনীয় মেরামত ও সম্প্রসারণ করা।
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মেরামত করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সময়মত ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকা এবং নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।
- বার্ষিক কর্মসূচি ও রুটিন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খাতাপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা।
- বিদ্যালয়ে সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- বিদ্যালয় এলাকার সব শিশু যাতে বিদ্যালয়ে আসে এবং লেখাপড়া শেষ হওয়া না পর্যন্ত বিদ্যালয় ত্যাগ না করে সেদিকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৎপর থাকবেন।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসারে পরিচালনা করা।
- মনোবিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয়, আত্মজ্ঞান, ও আত্মশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা।
- বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষার্থী শিক্ষককে উৎসাহিত করা এবং সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টীকা ও ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন সংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তোলা।
- ফুলফল, তরিতরকারী ও শাকসব্জীর বাগান করা ও এগুলো সংরক্ষণ করা।
- সম্ভব হলে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা।
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভব হলে বইখাতা, পেন্সিল, জামাকাপড় সরবরাহ করা।
- শিক্ষকদের কার্যকালীন পেশাগত উন্নতির ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে প্রয়োজনবোধে নমনীয় হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ২

অ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. বিদ্যালয়ে ---------- এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ---------- হয় এবং জীবন হয় --------- ।

২. বিদ্যালয়ের কার্যাবলীকে -------- ও --------- ঃ এই দুইভাবে বিভক্ত করা যায় ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার মূলনীতিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন ।

২. বিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান ১০টি মূলনীতি লিখুন ।

সঠিক উত্তর

অ) ১। সমগ্র কার্যাবলী, সার্থক, পরিপূর্ণ ।

২। অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ।

পাঠ - ৩

বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অভিভাবকের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- সহকারী শিক্ষকের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবেন ।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন ।

অভিভাবকের ভূমিকা

শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষক-এর মধ্যে কার দায়িত্ব বেশি – এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা যে সব চাইতে বেশি প্রয়োজন এ সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নেই । শিক্ষক তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে অভিভাবকের ওপর কত বেশি নির্ভরশীল আর অভিভাবক তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কত বেশি সচেতন এ বিষয়টি আমাদের জানা প্রয়োজন ।

গুরুত্ব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মদিবসের ৩ থেকে ৪ ঘন্টা শিশুরা বিদ্যালয়ে এবং অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় তারা বাড়ির পরিবেশে অভিভাবকের সান্নিধ্যে কাটায় । শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন গৃহ পরিবেশের প্রভাব কত বেশি আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক নিরক্ষরতার কারণে তা উপলব্ধি করতে পারে না । শিক্ষাদান মাতা-পিতা-অভিভাবক ও শিক্ষকের যৌথ দায়িত্ব । তাই বিদ্যালয় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অভিভাবকের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন অতীব গুরুত্বপূর্ণ । অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন, তার কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- শিক্ষার্থীর দৈনিক পাঠ প্রস্তুতির ব্যাপারে অভিভাবক লক্ষ্য রাখবেন ।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে শিশুর মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে অভিভাবক সে বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকবেন ।
- অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে গমন করে শিক্ষকের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করবেন ।
- বিদ্যালয়ের সমাজ নির্ভর কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং বিদ্যালয়ের উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে অভিভাবকগণ সহায়তা করতে পারেন । অবশ্য এসব কাজের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হবে ।
- অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করবেন ।
- স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে অভিভাবকগণ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সহযোগিতা করবেন ।

- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হতে পারেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- অভিভাবকগণের সহযোগিতা লাভের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করবেন।

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনায় দলনেতা হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও তিনি শ্রেণী শিক্ষাদান করেন। সহকারী শিক্ষকগণের শ্রেণী শিক্ষাদান কার্য তত্ত্বাবধানও তার একটি প্রধান দায়িত্ব।

উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, বিভিন্ন সভায় যোগদান ও অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন। তিনি ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্বও পালন করেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্বও তাঁর। ফলে বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে তিনি নীতি নির্ধারক ও সাংগঠনিক নেতা। তাঁর দক্ষতার ওপর বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অনেকট নির্ভরশীল। সে জন্যই বলা হয়ে থাকে– As is the headmaster so is the school.

সহকারী শিক্ষকের ভূমিকা

সহকারী শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় প্রধান শিক্ষককে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সহকারী শিক্ষকগণ শ্রেণী শিক্ষণ, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রগতিপত্র প্রস্তুতকরণ ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিদ্যালয়ের সম্পদ ও ভবনের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহকারী শিক্ষকগণ লক্ষ্য রাখেন। শিক্ষক-অভিভাবক যোগসূত্র রাখার বিষয়ে সহকারী শিক্ষকদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় এলাকার স্কুল গমনোপযোগী শিশু জরিপ কাজ সম্পন্ন করা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এলাকায় শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, অনুপস্থিত শিশুদের তালিকা তৈরি, অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান এবং বিদ্যালয়ে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা, এসব বিষয়ে সহকারী শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষককে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণ সাধন লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুকে জানার সাথে সাথে শিক্ষার্থীকেও জানার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। তাই বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার পরিবর্তে বর্তমানকালে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও স্থানীয় পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে শিশুর সার্বিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, নির্দেশ পালন করে, বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক কর্মপুঞ্জি অনুসরণ করে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা মেনে চলে। এসবের মধ্য দিয়ে তারা বিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে।

অভিভাবক ও শিক্ষকগণের মধ্যে যোগাযোগসূত্র হলো শিক্ষার্থীরা। তাদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনে অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করা যায়। বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণে শিক্ষার্থীরা বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। তাদের সমাজ স্বীকৃত আচার-আচরণ ও বিদ্যালয়ের নিয়মবিধি অনুসরণ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করে। শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সমর্থন ও সহযোগিতার সফল হয়ে থাকে। কাজেই বিদ্যালয় শিক্ষাদান, সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্য পরিচালনা, শ্রেণী প্রশাসন ও বিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকার কথা বিবেচনা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

ক. শিক্ষক

খ. শিক্ষার্থী

গ. অভিভাবক

ঘ. শিক্ষা প্রশাসক

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত কী?

ক. সুষ্ঠু পরিচালনা

খ. শিক্ষাক্রমের আধুনিকীকরণ

গ. শিক্ষকগণের আগ্রহ

ঘ. শিক্ষার্থীর আনুগত্য

৩. বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী?

ক. শিক্ষার্থীর কল্যাণ সাধন

খ. শিক্ষকগণের চাকুরীর নিশ্চয়তা করে

গ. সমাজস্বীকৃত গুণাবলি অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা

ঘ. শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক স্থাপন

৪. শিক্ষক-অভিভাবকদের মাঝে যোগসূত্র কোনটি?

ক. সহকারী শিক্ষক

খ. শিক্ষার্থী

গ. ম্যানেজিং কমিটি

ঘ. প্রধান শিক্ষক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অভিভাবকগণ কী কী উপায়ে সহায়তা করতে পারেন?

২. বিদ্যালয় পরিচালনায় সহকারী শিক্ষকগণের ভূমিকা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

৩. বিদ্যালয় প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক কী দায়িত্ব পালন করেন?

৪. "অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগসূত্র হলো শিক্ষার্থীরা"। চারটি বাক্যে এই কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।খ, ২।ক, ৩।ক, ৪।খ।

পাঠ - ৪ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ঃ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা; সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা কিভাবে প্রণয়ন করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক রুটিনের প্রয়োজনীয়তা ও রুটিন প্রণয়নের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ে সারা বছরব্যাপী শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম চলতে থাকে। এসব কার্যাবলীর একটি সামগ্রিক তালিকা এবং কখন কোনো কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হতে পারে তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখাই বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

একটি শিক্ষাবর্ষের শেষে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য এই বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম, টার্মিনাল, বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের কথা মনে রাখতে হবে যাতে সেগুলো নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদযাপনযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম হচ্ছে – বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসসমূহ, পুরস্কার বিতরণী সভা, অভিভাবক দিবস প্রভৃতি।

কর্ম পরিকল্পনার প্রতিটি কর্মের পরিচালনার দায়িত্ব পূর্বাহ্নে শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে যাতে তারা নির্ধারিত দায়িত্ব যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে কর্মসূচি বিন্যাস করা যেতে পারে।

শিক্ষাক্রমিক কর্মসূচি বিন্যাসের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী উপযুক্ত সময়ের সাথে মিল রেখে প্রতি শ্রেণীর পাঠ্যসূচিকে যথারীতি ভাগ করে মাসিক, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পূর্ববর্তী ও চলতি বর্ষের বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা ও সংশ্লিষ্ট বর্ষের সরকারী ছুটির তালিকা সামনে রাখা ভাল।

অপর পৃষ্ঠায় বার্ষিক পরিকল্পনার একটি ছক দেওয়া হলো।

বিদ্যালয়ের নামঃ

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ শিক্ষাবর্ষ

ক্রমিক নং	কাজের/অনুষ্ঠানের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসম্পাদানের সময়সীমা												বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ
			জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জুলাই	আ	সে	অ	ন	ডি	
১	বিদ্যালয়ের রেকর্ড পত্র, রেজিস্ট্রার, নথিপত্রের তালিক হালফিল করণ														
২	শিক্ষাপক্ষ পালণ														
৩	বার্ষিক পুরুস্কার বিতরণী														
৪	বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান														
৫	অভিভাবক দিবস পালন														
৬	বিদ্যালয় এলাকার শিশু জরিপ														
৭	ভর্তিযোগ্য শিশুদের ভর্তিকরণ														
৮	বইয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যার জন্য তালিকা প্রেরণ														
৯	বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন														
১০	বই গ্রহণ ও বিতরণ														
১১	ক্রমপুঞ্জিতে রেকর্ড হালফিলকরণ														
১২	বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন														
১৩	সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন														
১৪	শিক্ষক কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদন তৈরি														
১৫	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা														
১৬	খাতা দেখা সমাপ্তকরণ ফলপ্রকাশ														
১৭	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর পরিকল্পনা														
১৮	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান														
১৯	দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা														
২০	খাতা দেখা সমাপ্তকরণ ফলপ্রকাশ														
২১	বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী নির্বাচন														
২২	বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বিশেষ কোচিং														
২৩	বার্ষিক পরীক্ষা														
২৪	খাতা দেখা সমাপ্তকরণ ফলপ্রকাশ ও শিশুদের শ্রেণী উত্তরণ														
২৫	ম্যানেজিং কমিটির সভা														
২৬	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সভা														
২৭	শিশু ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও অনুপস্থিত শিশুর অভিভাবকদের নিকট গমন														
২৮	জাতীয়, ধর্মীয়, গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ														
২৯	বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস														

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে সহকারী শিক্ষকগণ এর খসড়া তৈরির কাজে সহযোগিতা করতে পারেন। এই খসড়া পরিকল্পনা শিক্ষকমন্ডলীর সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন করা যেতে পারে। চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা সুন্দর হস্তাক্ষরে বা টাইপ করে এবং সম্ভব হলে মুদ্রণ করে শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার সুফল

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক একাডেমিক, সহ-শিক্ষাক্রমিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার অনেক সুফল রয়েছে। যেমনঃ

- নির্ধারিত কার্য যথাসময়ে সম্পাদনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।
- যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কমিটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।
- বছরব্যাপী কর্ম বিন্যস্ত থাকে বলে সারা বছর ধরে বিদ্যালয় কর্মমুখর থাকে।
- পরিকল্পনায় কাজের বিবরণ, লক্ষ্যমাত্রা ও সম্পাদনের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে বলে কর্ম সম্পাদনে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।
- কর্ম পরিকল্পনা শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি বিষয়ের নির্ধারিত পাঠসমূহ যাতে যথাসময়ে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় সেজন্য বছরের শুরুতেই সারা বছরের জন্য প্রতি বিষয়ের কর্মঘন্টা নিরূপণ করা হয়। নির্ধারিত কর্মঘন্টার সংখ্যা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তককে বিভাজন করে প্রতি কর্মঘন্টায় পাঠদানের জন্য কতখানি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা স্থির করা হয়। এভাবে পরিকল্পিত পাঠদানের সময়সূচী প্রণয়নকে বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনা বলা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাৎসরিক কর্মদিবস সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত কর্মদিবসের মোট পিরিয়ড সংখ্যা শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়। এভাবে সকল বিষয়ের বছরে কতটি কর্মঘন্টা পাওয়া যাবে তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তককে কর্মঘন্টার সংখ্যানুপাতে বিভাজন করে প্রতি পাঠের পরিসর নির্ধারণ করতে হয়।

মূল পাঠ্য পুস্তককে ৩ টার্মে বিভক্ত করে ১ম, ২য় ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষককে যত্নশীল হতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়বস্তুর পাঠ দান সমাপ্ত করা হয়।

উল্লেখ্য প্রতি কর্মঘন্টায় পাঠ দানের জন্য শিক্ষককে দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা করতে হয়।

অপর পৃষ্ঠায় একটি নমুনা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা দেয়া হলো।

নমুনা

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা
চতুর্থ শ্রেণী
বিষয় ঃ পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

শিক্ষক ঃ

সাময়িকী কার্যদিবস	বিষয়বস্তু/পাঠ	পিরিয়ড	পাঠ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১ম সাময়িকী	প্রথম অধ্যায় : পরিবেশ ও ভূমি ব্যবহার	৫		
১০-১-২০১১ হতে	ও সরংক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা,	৪		
৩০-৬-২০১১ পর্যন্ত	জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার ফলাফল	৪		
জানুয়ারি সহপাঠ				
	দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিবেশ, প্রকৃতি ও	৪		
ফেব্রুয়ারি -২৩ দিন	মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীব পরিবেশ,	৪		
মার্চ - ২৫ দিন	মানব জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব,	৫		
এপ্রিল - ১৫ দিন	অতীতে বাংলাদেশের পরিবেশ ও	৬		
মে- ৪ দিন	প্রকৃতির প্রভাব, পরিবেশ ও পশুপাখি,	৭		
জুন - ১৬ দিন	পুনরালোচনা ও পরীক্ষা	৩		
মোট = ৮৩ দিন ৮৩÷২=৪২ দিন	মোট	৪২		
২য় সাময়িকী	তৃতীয় অধ্যায় : অঞ্চল ও আঞ্চলিক	৫		
১-৭-২০১১ হতে	পরিবেশ ঢাকা বিভাগ	৪		
৩০-৯-২০১১ পর্যন্ত	চট্টগ্রাম বিভাগ	৪		
	রাজশাহী বিভাগ	৪		
জুলাই - ২৭ দিন	খুলনা বিভাগ	৪		
আগস্ট - ২০ দিন	জনহিতকরণ প্রতিষ্ঠান	৫		
আগস্ট - ২০ দিন	পুনরালোচনা	৬		
সেপ্টেম্বর-২৩ দিন	পরীক্ষা	৩		
মোট =৭০ দিন ৭০÷২=৩৫ দিন	মোট	৩৫		
৩য় সাময়িকী	চতুর্থ অধ্যায় : আঞ্চলিক পরিবেশ ও			
১-১০-২০১১ হতে	মানুষের জীবন ধারা			
৩১-১২-২০১১ পর্যন্ত	সমভূমি অঞ্চল	৪		
অক্টোবর - ১৯ দিন	বনাঞ্চল	২		
নভেম্বর - ২৩ দিন	পাহাড়ী অঞ্চল	২		
ডিসেম্বর - ১৫ দিন	অনুশীলনী	৩		
	বাংলাদেশে উপজাতীদের জীবন ধারা ও			
	সংস্কৃতি	৭		
	সামগ্রিক পুনরালোচনা	৭		
	পরীক্ষা	৩		
মোট =৫৭ দিন ৫৭÷২=২৮ দিন	মোট	২৮		

সাপ্তাহিক সময়-তালিকা (রুটিন) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় সাপ্তাহিক সময় তালিকা বা রুটিন। সাপ্তাহিক রুটিন বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কাঠামোতে বিভিন্ন বিষয়ের পিরিয়ড সংখ্যা উল্লেখিত রয়েছে। সেই সংখ্যা অনুযায়ী সাপ্তাহিক রুটিন তৈরি করা হয়। রুটিন তৈরির ২টি পদ্ধতি হচ্ছে (১) সাপ্তাহিক কর্মদিবস ভিত্তিক ও (২) শিক্ষকভিত্তিক। প্রথমটি শিক্ষার্থীদের অনুসরণের জন্য এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষকদের জন্য। শিক্ষকভিত্তিক রুটিন থেকে প্রধান শিক্ষক এক নজরে শিক্ষকদের দৈনিক কার্যভার ও পিরিয়ডভিত্তিক অবস্থান জানতে পারেন। উভয় প্রকার রুটিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় ও শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়নে সাপ্তাহিক রুটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকদর্শন। তাই রুটিনকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা হয়। রুটিন প্রস্তুতির কাজটি বেশ জটিল। সময় তালিকা প্রণয়নের সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয় এবং বিদ্যালয়ের কাজের ব্যাপ্তি ইত্যাদির মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। সময় তালিকা প্রণয়নকালে কতকগুলো নীতি অনুসরণ করা শ্রেয়। নিম্নে রুটিন প্রণয়নের কিছু নীতি উল্লেখ করা হলোঃ

- শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষে সকল শ্রেণীকে একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীদের বয়স ও সমর্থ অনুযায়ী একটি পাঠ পঠনের জন্য সময় নির্ধারণ করা।
- পর্যায়ক্রমে দিনের প্রথমভাগে কঠিন বিষয় ও শেষভাগে সহজ বিষয় রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত বিষয়সমূহ সবশেষ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।
- বিষয়ের গুরুত্ব, কাঠিন্য ও পরিসর অনুযায়ী দৈনিক ও সাপ্তাহিক কত পিরিয়ড পাঠ দেয়া সমীচীন তা নির্ধারণ করা।
- শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বিবেচনা করে শিক্ষাদানের কাজের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা।
- প্রত্যেক শিক্ষককে দৈনিক কিছু সময় বিশ্রাম দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- কর্মদিবসের মধ্যভাগে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্য ৩০ মিনিট বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করা।
- শ্রেণী শিক্ষককে তাঁর শ্রেণীতে পিরিয়ড ও বিষয় শিক্ষককে তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়ের পিরিয়ড দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা।
- কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা।
- প্রত্যেক পিরিয়ডের পর পাঁচ মিনিট করে কর্মবিরতির ব্যবস্থা করা।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শ্রেণীশিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

রুটিন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত রুটিনের বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকমণ্ডলীর উপর। রুটিন অনুসারে শিক্ষকগণ ক্লাস নেবেন এবং সকল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা করবেন। শিক্ষক যদি রুটিন অনুসরণ না করে খুশিমত সময় ব্যয় করেন অথবা তিনি নির্ধারিত পিরিয়ড না নেন তাহলে রুটিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে পড়ে। তাই শিক্ষকগণ যাতে রুটিনে নির্ধারিত বিষয়ের পিরিয়ড অনুযায়ী ক্লাস নেন এবং নির্দিষ্ট সময় ব্যাপ্তি অনুসরণ করে পাঠদান করেন যে বিষয় প্রধান শিক্ষককে লক্ষ রাখতে হবে। প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে শ্রেণী পরিদর্শন করবেন এবং রুটিন বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা দেখা দিলে শিক্ষকদের সহযোগিতায় তা যথাশীঘ্র সমাধান করবেন। এর ফলে রুটিনের বাস্তবায়নজনিত সমস্যা হ্রাস পাবে।

কোনো শিক্ষক ছুটিতে গেলে অথবা শিক্ষকের সংখ্যা কম হলে একজন শিক্ষককে কখনো একত্রে দুই শ্রেণীর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক নিজের সুবিধা অনুযায়ী দুই শ্রেণীর পাঠদানের বিষয় পদ্ধতি ঠিক করে নেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৪

অ) নিম্নের বক্তব্য সত্য হলে ‘স’, মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন ঃ

১. বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একই কাজ।
২. সারা বছর কোনো বিষয়ে কতটি পাঠদান করা হবে, ইহা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।
৩. সাপ্তাহিক সময় তালিকা তৈরি করা হয় বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করে।
৪. কর্মদিবসভিত্তিক রুটিন শিক্ষার্থীদের অনুসরণের জন্য সুবিধাজনক।
৫. প্রতি বিষয়ের প্রতি পিরিয়ডের সময়ব্যাপ্তি শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে দেওয়া আছে।

আ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়?
ক. সারা বছরের সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলী
খ. সারা বছরব্যাপী যে সমস্ত কর্মকাণ্ড হয় তার একটি সামগ্রিক তালিকা
গ. বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানযোগ্য কার্যাবলীর একটি তালিকা
ঘ. তাৎপর্যপূর্ণ দিবস ও অনুষ্ঠানমালা

২. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে কর্মদিবসের সংখ্যার প্রয়োজন হয় কেন?
ক. বছরের কর্ম দিবসের হিসাবের জন্য
খ. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতদিন লাগবে তা স্থির করার জন্য
গ. বইয়ের পাঠ্যসূচির দৈনিক পাঠদানের বিষয় স্থির করার
ঘ. পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য

৩. শিক্ষকগণের মধ্যে ক্লাস বন্টনে কোন নীতি সঠিক?
ক. শ্রেণী শিক্ষককে তাঁর শ্রেণীতে এবং বিষয় শিক্ষককে তাঁর বিষয়ে ক্লাস প্রদান
খ. সকল শিক্ষককে যোগ্যতাভিত্তিক ক্লাস বন্টন
গ. ক্লাস বন্টনে যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিরুচি বিবেচনা করা
ঘ. ক্লাস বন্টন সকলকে সমপরিমান বিশ্রাম দেয়া

৪. কোনটি যথার্থ বক্তব্য?
ক. কখনো কোনও শিক্ষককে একই পিরিয়ডে দুই শ্রেণীর দায়িত্ব নিতে হয়
খ. কখনো একই পিরিয়ডে এক শিক্ষককে দুই শ্রেণীর দায়িত্ব দেয়া যাবে না
গ. প্রধান শিক্ষক নিজের ক্লাস অন্য শিক্ষককে দিয়ে নেওয়াতে পারেন
ঘ. ক্লাস বন্টন প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছামত হবে

ই) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বলতে কী বুঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. বিদ্যালয়ের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।
৩. রুটিন প্রণয়নের নীতিমালার তালিকা তৈরি করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। মি, ২। স, ৩। মি, ৪। স, ৫। স।
আ) ১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ক।

পাঠ - ৫

পত্র যোগাযোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পত্র যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের পত্র যোগাযোগের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যের প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিস এর স্থানীয় এলাকার লোকজনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। প্রধানত তিনি পত্রের মাধ্যমে থানা শিক্ষা অফিস, থানা পরিষদ, জেলা শিক্ষা অফিস ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেও তাঁকে নানা প্রকারের পত্র লিখতে হয়। এইসব পত্র যোগাযোগ প্রধানত দু'শ্রেণীর ঃ (১) সরকারী (Official) এবং (২) আধা-সরকারী (Semi-Official)। প্রয়োজনে কখনো ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে হয়। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণ পত্র যোগাযোগের নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

অফিসিয়াল পত্রের ভাষা ও রচনারীতি

ব্যক্তিগত পত্রের সঙ্গে অফিসিয়াল পত্রের আঙ্গিক, রচনাশৈলী ও ভাষা ব্যবহারের কিছু পার্থক্য আছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলোঃ

- অফিসিয়াল পত্রের অনুভূতি বর্জন করতে হবে।
- অফিসিয়াল পত্রের আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখতে হয়।
- পত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ভাষা সহজ, বোধগম্য ও দ্ব্যর্থহীন হবে, দীর্ঘ বাক্য বর্জনীয়।
- শব্দ চয়ন প্রাসঙ্গিক এবং বানান নির্ভুল হবে।
- অনুচ্ছেদ ও বিরাম চিহ্ন যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।
- সামগ্রিক উপস্থাপনায় পরিমিতবোধ, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে।
- শিষ্টাচার ও বিনয় রক্ষায় প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ৫

অ) শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ------- ও ------ এর সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয় ।

২. পত্র যোগাযোগগুলো সাধারণত ------ ও ------ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ।

আ) ব্যবহারিক কাজ

১. প্রধান শিক্ষকের সাধারণত যাদের সাথে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য পত্র যোগাযোগ করতে হয় তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন ।

সঠিক উত্তর

অ) ১। জেলা শিক্ষা অফিস, ম্যানেজিং কমিটি, ২। সরকারী, আধাসরকারী ।

পাঠ - ৬

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার একটি অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে অর্থ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা । কোনো প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থের যোগান ও প্রাপ্ত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের নীতি ও পদ্ধতিকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে । আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কিছু দায়িত্ব রয়েছে ।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক বিধায় এর ব্যয়ভার সরকার বহন করে । বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী । সরকারী কোষাগার থেকে তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হয় । শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোনো ফি বা বেতন আদায় করা হয় না । সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষকের সংখ্যা হিসাবে অনুষঙ্গ ব্যয়ের জন্য প্রতি বিদ্যালয় সরকারী মঞ্জুরী পায় । তবে ইদানিং উন্নয়ন কার্যের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা হচ্ছে । অনুষঙ্গ খাত ও উন্নয়ন খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় পরিচালনা ও হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষককে অবহিত হতে হবে ।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয় । এসব বিদ্যালয়ের আয়ের প্রধান উৎস হলো শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত ফী, সরকারী অনুদান ও দানশীল সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিদের প্রদত্ত ডোনেশন । বিদ্যালয়ের এসব আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

খাতা পত্র, রেকর্ড রেজিস্টার, চক, ডাস্টার ইত্যাদি ক্রয় বাবদ আনুষঙ্গিক খাতের ও উন্নয়ন খাতের অর্থ ব্যয়ের ভাউচার, হিসাব বই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । সরকারী অর্থ ব্যয়ের জন্য সরকারী নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে । ক্রয়কৃত মালামালের স্টক রেজিস্ট্রারে উঠাতে হবে । হিসাব নিরীক্ষণের জন্য ভাউচারগুলো নির্ধারিত ফাইলে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন । যদি বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোনো অর্থ আদায় করা হলে এসব অর্থ নির্দিষ্ট ক্যাশ হতে উঠাতে হবে । ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে এই অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ের হিসাব রাখা বাঞ্ছনীয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কার?
   - ক. প্রধান শিক্ষকের
   - খ. ম্যানেজিং কমিটির
   - গ. স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের
   - ঘ. অভিভাবক সমিতির

২. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অনুষঙ্গ ও উন্নয়ন খাতের উৎস কোনটি?
   - ক. সরকার
   - খ. স্থানীয় সমাজ
   - গ. দাতা
   - ঘ. ম্যানেজিং কমিটি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষক কী দায়িত্ব পালন করেন?

সঠিক উত্তর

অ) ১।ক, ২।ক।

পাঠ - ৭

ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি : গঠন ও দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও এর দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির গুরুত্ব, গঠন ও দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন কাঠামো

প্রত্যেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিম্নে বর্ণিত ১১জন সদস্য সমন্বয়ে একটি ম্যানেজিং কমিটি থাকবে। এদের মধ্যে ৩ প্রকারের সদস্য থাকেনঃ

১. পদাধিকার বলে	সদস্য	২ জন
২. মনোনীত সদস্য	সদস্য	২ জন
৩. নির্বাচিত	সদস্য	৫ জন

পদাধিকার বলে সদস্য

১. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ------ ১ সদস্য সচিব

২. বিদ্যালয় যে ইউনিয়নে অবস্থিত সে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অথবা পৌরসভার কমিশনার ----- ১ সদস্য

মনোনীত সদস্য

৩. বিদ্যালয় এলাকার একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি (থানা পরিষদ মনোনীত)-১ সদস্য

৪. বিদ্যালয় এলাকার একজন মহিলা প্রতিনিধি (থানা পরিষদ মনোনীত) - ১ সদস্য

৫. একজন দাতা (থানা পরিষদ মনোনীত) ----- ১ সদস্য

৬. বিদ্যালয়ের নিকটতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনোনীত) -----১ সদস্য

নির্বাচিত সদস্য

৭. সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রতিনিধি (শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত) -- ১ সদস্য

৮-১১. ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক কর্তৃক নির্বাচিত -- ৪ সদস্য

ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবেন না।

কার্যকাল ঃ ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ৩ বৎসর।

ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী

- বিদ্যালয়ের কার্যাবলী পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি

বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষক অভিভাবক সমিতির গঠন প্রণালী নিম্নরূপঃ

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সকল অভিভাবক এই সমিতির সাধারণ সদস্য থাকবেন। সমিতির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে। নির্বাহী কমিটিতে নিম্নরূপ সদস্য থাকবেনঃ

১. বিদ্যালয় এলাকার একজন প্রভাবশালী, পরোপকারী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি -- সভাপতি

২-৩. দু'জন চরিত্রবান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ----- সহ-সভাপতি

৪. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ------ সদস্য সচিব

৫. এলাকার সমাজসেবামূলক কমিটির (যদি থাকে) সভাপতি/চেয়ারম্যান------------ সদস্য

৬. বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/চেয়ারম্যান ----------- সদস্য

৭. এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য ----------- সদস্য

৮. এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (যদি থাকে) প্রধান শিক্ষক ----------- সদস্য

৯. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা ----------- সদস্য

১০. একজন মসজিদের ইমাম ----------- সদস্য

১১-১৩. অভিভাবক প্রতিনিধি ৩ জন ----------- সদস্য

১৪. মহিলা সমিতির (যদি থাকে) একজন প্রতিনিধি ----------- সদস্য

১৫. গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন কৃষি সম্প্রসারণকর্মী ----------- সদস্য

১৬. সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ------- পৃষ্ঠপোষক

নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্থানীয় এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন এ কমিটি তার সবই করবে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ:

- এলাকার বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সকল ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিধান করা।
- ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীকে অকালে বিদ্যালয়ে ত্যাগ করা থেকে রক্ষা করা।
- বিদ্যালয় গৃহ মেরামত এবং এর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়কে এলাকার সকল পেশাজীবী লোকের জন্য একটি সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা।
- বিদ্যালয়কে স্থানীয় লোকজনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।
- স্থানীয় সরকারী, আধা-সরকারী সংস্থার সম্প্রসারণ কর্মী কর্তৃক তাঁদের বিভিন্ন প্রকার জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিদ্যালয়কে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়া।
- উন্নত ধরনের কৃষি, মাছের চাষ, হাঁসমুরগী পালন, শাকসব্জি ও ফলমূল উৎপাদন এবং সমবায় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মাতাপিতার জীবিকার উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করা।
- শিশু ও তার পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি বিধানে সাহায্য করা।
- বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস ও সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলা।

শিক্ষক অভিভাবক সমিতিকে যথার্থভাবে কার্যকরী করতে হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অভিভাবকদের জন্য কর্মশিবির অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এরূপ কর্মশিবিরে বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিবেশ গৃহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন উপায় স্থির করা যেতে পারে। শিশু মনোবিজ্ঞান এবং শিশুর ক্রমবিকাশের জন্য শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকগণ কি ভূমিকা পালন করতে পারেন সে সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে মনোনীত সদস্য কতজন?
   - ক. ১ জন
   - খ. ২ জন
   - গ. ৩ জন
   - ঘ. ৪ জন

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে মহিলা সদস্য কে মনোনীত করেন?
   - ক. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি
   - খ. থানা শিক্ষা অফিসার
   - গ. থানা পরিষদ
   - ঘ. ম্যানেজিং কমিটি

৩. শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সাধারণ সদস্য কারা?
   - ক. শিক্ষকগণ
   - খ. অভিভাবকগণ
   - গ. স্থানীয় নেতৃবৃন্দ
   - ঘ. ক ও খ

৪. শিক্ষক অভিভাবক সমিতির সভাপতি কে হবেন?
   - ক. থানা নির্বাহী অফিসার
   - খ. থানা শিক্ষা অফিসার
   - গ. সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার
   - ঘ. এলাকার প্রভাবশালী, পরোপকারী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি এলাকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কী কী দায়িত্ব পালন করতে পারে তা উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ঘ।

পাঠ - ৮

রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণের গুরুত্ব, তালিকা ও সংরক্ষণ কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিসে রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণের গুরত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিসে রেজিস্টার ও নথিপত্রের তালিকা প্রণয়ন করতে পারবেন ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অফিসে রেজিস্টার ও নথিপত্র সংরক্ষণের কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ।

নথিবদ্ধকরণের গুরুত্ব

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন কার্য সম্পর্কিত রেজিস্টার ও নথিপত্র। একাডেমিক কার্য সম্পাদন, ছাত্রভর্তি, শিক্ষক কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য, উর্ধ্বতন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সভা-সমিতির আহ্বান, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ, প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ, চিঠিপত্র সংরক্ষণ ও বিদ্যালয়ের জন্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, প্রয়োজনীয় দলিল ইত্যাদি সব ধরনের তথ্যের রেকর্ড যথাযথ সংরক্ষণের দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। তাই এই সমস্ত কাগজপত্র ও রেজিস্টার সঠিকভাবে নথিকরণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

নথিপত্র বা রেকর্ডপত্র রীতি অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করে রাখাকে ফাইলিং বা নথিবদ্ধকরণ বলা হয়। সুশৃঙ্খল নথিবদ্ধকরণের ফলে বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত জরুরী কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কাগজপত্র যথাসময়ে পাওয়া যায়। প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসনে দক্ষতা এর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

বিদ্যালয়ের রেজিস্টার এর তালিকা

বিদ্যালয়ের রেজিস্টারসমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে তালিকাভুক্ত করে দেখানো হলোঃ

একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কিত

- বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাপ্ত বই রেজিস্টার
- বিতরণকৃত বইয়ের হিসাব বিবরণী রেজিস্টার
- গ্রন্থাগারের গ্রন্থ তালিকা রেজিস্টার
- গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ ইস্যু রেজিস্টার
- শিক্ষা উপকরণ রেজিস্টার

- পাঠটীকা গাইড রেজিস্টার
- পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ রেজিস্টার
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড রেজিস্টার

ছাত্রছাত্রী সংক্রান্ত রেজিস্টার

- ভর্তি রেজিস্টার (১ম শ্রেণীতে ভর্তির ফরম ৫ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে)
- ছাত্র ছাত্রীর হাজিরা রেজিস্টার
- ছাত্র ছাত্রীর স্কুল স্থানান্তর রেজিস্টার
- শিশু জরিপ রেজিস্টার
- বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর তালিকা রেজিস্টার
- পুরস্কার বিতরণী রেজিস্টার

শিক্ষক সংক্রান্ত রেজিস্টার

- শিক্ষক হাজিরা রেজিস্টার
- শিক্ষকগণের ছুটি রেজিস্টার
- শিক্ষকদের সার্ভিস ফাইল

কমিটি/সমিতি সংক্রান্ত নোটিশ ও কার্যবিবরণী রেজিস্টার

- ম্যানেজিং কমিটি
- শিক্ষক পরিষদ
- শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি
- বাধ্যতামূলক শিক্ষা কমিটি

প্রশাসনিক রেজিস্টার

- নোটিশ বই (এই বইতে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাতার্থে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদান করে থাকেন)।
- বিদ্যালয় পরিদর্শন মন্তব্য বই

আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর হিসাব রেজিস্টার

- আসবাবপত্র রেজিস্টার
- খেলাধুলা সামগ্রী রেজিস্টার
- অফিস সামগ্রী রেজিস্টার

হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার

- আর্থিক লেনদেন, আনুষাঙ্গিক ও উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের হিসাব রেজিস্টার

চিঠিপত্র প্রাপ্তি ও বিতরণ সংক্রান্ত রেজিস্টার

- চিঠিপত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার
- চিঠিপত্র প্রেরণ রেজিস্টার
- চিঠিপত্র বাহক মারফত বিলি রেজিস্টার

নথিপত্রের তালিকা

কিছু কিছু তথ্য আছে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার চাইতে পৃথক শীটে লিপিবদ্ধ করে এ শীটগুলো সংশ্লিষ্ট নথিকে (ফাইলে) সংরক্ষণ করা সুবিধাজনক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের তালিকা নিচে দেওয়া হলো ঃ

- ক্লাস্টার ট্রেনিং শিক্ষক সহায়িকা সংরক্ষণ ফাইল
- ক্লাস্টার ট্রেনিং সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংরক্ষণ ফাইল
- ক্লাস্টার ট্রেনিং আকস্মিক পরিদর্শন ফাইল
- ক্লাস্টার ট্রেনিং মূল্যায়ন তথ্য ফাইল
- সময়সূচি সংরক্ষণ ফাইল
- মাসিক রিটার্ণ ফাইল
- বার্ষিক রিটার্ণ ফাইল
- ভাউচার ফাইল
- চিঠিপত্র সংরক্ষণ ফাইল
- শিক্ষকগণের জীবনতথ্য ফাইল (প্রত্যেকের জন্য পৃথক ফাইল)
- শিক্ষকগণের ছুটির দরখাস্ত ফাইল
- শিক্ষার্থীগণের ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড ফাইল
- ভূমিকর, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংক্রান্ত ফাইল

নথিপত্র সংরক্ষণ কৌশল

সকল প্রকার তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার ও নথিপত্র যথাযথ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব। সুষ্ঠুভাবে নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য নিম্নের কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

- নথিবদ্ধকরণ সহজ ও সরল পদ্ধতিতে করতে হবে এবং বিষয়ভিত্তিক ক্রমান্বয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রয়োজনের সময় সহজে এবং তাৎক্ষণিকভাবে নথিপত্র পাওয়া যায় এমনভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে।

- নথিপত্র যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য সতর্কতার সাথে এসব সংরক্ষণ করতে হবে।
- নথিপত্র বর্ণমালা বা সংখ্যার ক্রমে সাজিয়ে একটির উপর আর একটি এভাবে স্তুপাকারে রাখা হয়। এই পদ্ধতিকে সমান্তরাল নথিবদ্ধকরণ পদ্ধতি বলা হয়। কাগজে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা লিখে তা প্রতিটি ফাইলে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলে সহজে ফাইল শনাক্ত করা যায়।
- নথি সংরক্ষণের আধুনিক ও বিধিসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে 'খাড়া নথিবদ্ধকরণ পদ্ধতি'। সমান্তরাল পদ্ধতির পরিবর্তে খাড়া পদ্ধতিতে নথি রাখলে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ফাইলের কাভারে ফাইলের বিবরণ লেখা উভয় পদ্ধতিতেই বাঞ্ছনীয়।
- আলমারীতে, ড্রয়ারে বা তাকে ফাইল সাজিয়ে রাখা শ্রেয়।
- রেজিস্টার ও নথি-পত্রসমূহের সূচি তৈরি করে রাখা বাঞ্ছনীয় এতে প্রয়োজনীয় নথি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে Ⓚ বৃত্তায়িত করুন)

১. নথিবদ্ধকরণ বলতে কী বুঝায়?
   ক. প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ফাইলে ফিতা দ্বারা বেঁধে রাখা
   খ. রেকর্ডপত্র শ্রেণীবিন্যাস করে, শৃঙ্খলার সাথে সাজিয়ে রাখা
   গ. সরকারী আদেশ-নির্দেশ নথিতে সংরক্ষণ করা
   ঘ. অফিসের কাগজপত্রাদি সাজিয়ে আলমারীতে সংরক্ষণ করা

২. নথির সূচি থাকা প্রয়োজন কেন?
   ক. নথির সঠিক সংখ্যা জানা যায়
   খ. নথি হারানোর আশঙ্কা থাকে না
   গ. অফিসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়
   ঘ. প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়

৩. প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ভর্তি ফরম কত বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়?
   ক. ২ বছর
   খ. ৩ বছর
   গ. ৪ বছর
   ঘ. ৫ বছর

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নথিকরণ বলতে কী বুঝায়?
২. নথি সংরক্ষণের ৪টি কৌশল উল্লেখ করুন।
৩. বিদ্যালয়ের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার ও ৫টি নথি/ফাইলের বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। ঘ।

পাঠ - ৯

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও স্থানীয় জনগণের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০ এর প্রধান প্রধান বিধানসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন ।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে জনগণের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন) ১৯৮০ সালেল মধ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করার সুপারিশ করে । কিন্তু এসব সুপারিশ কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি । এরপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮১-৮৫) সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয । এই সময় থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অধিদপ্তর ও স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন করে এই স্তরে শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তরণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় ।

সর্বশেষ ১৯৯০ সনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন পাস করে (১৯৯০ সনের ২৭ নং আইন) । আলোচ্য পাঠে উক্ত আইনের বিধানসমূহ উদ্ধৃত করা হলো (আইনটি সংযোজন - ১ এ দেখানো হয়েছে) ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ (ধারা-৩)

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা দেশের যে কোনো এলাকার যে কোনো তারিখ হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে ।

(২) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে সেই এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর (৬-১১) অভিভাবক তাহার শিশুকে, যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে (এই কারণগুলো ৩ (২) উপধারায় বর্ণনা করা আছে) প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় অবস্থিত তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইবেন ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি (ধারা-৪)

(১) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইতে সেই এলাকার ইউনিয় বা পৌর এলাকাসমূহের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

এই কমিটির গঠন ও দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা আইনের ৫ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

দন্ড (ধারা - ৬)

(১) যদি কোনো কমিটি এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেক সদস্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো অভিভাবক ধারা ৫ (৭)–এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে পর পর তিনবার ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

অপরাধের বিচার (ধারা-৭)

কমিটির চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা (ধারা - ৮)

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারিবে।

এই শিক্ষা আইনটি ১৯৯২ সনের জানুয়ারি থেকে ৬৮টি নির্বাচিত থানায় কার্যকরী করা হয় এবং ১৯৯৩ সনের জানুয়ারি থেকে অবশিষ্ট সকল থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা একযোগে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশু জরিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিদ্যালয় এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুদের তালিকা তৈরি করে তা ওয়ার্ড কমিটি ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে দেয়া বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ। শিক্ষকগণ আন্তরিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করে বাধ্যতামূলক আইন বাস্তবায়নে প্রভূত সহায়তা দান করে থাকেন। এ আইনে শিশু জরিপের দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষা কমিটির ওপর অর্পিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এ কাজটি বিদ্যালয়কেই করতে হবে। তালিকা মত যে সকল শিশুর যে বছর নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার কথা, তারা ভর্তি হয়েছে কিনা, তা বিদ্যালয় দেখবে এবং যে সকল শিশু ভর্তি হয়েছে তাদের বিদ্যালয় ধরে রাখার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবে। আর যে সকল শিশু ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও অকালে ঝরে পড়েছে তাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদ্যালয় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারে।

আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে যে দণ্ড দানের বিধান রাখা হয়েছে তা শিক্ষকগণ অভিভাবকগণকে বুঝাতে পারেন। অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন সহজ হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা

আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্যই আইন। দেশের জনগণের সুখ-শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সকল নাগরিকের অধিকার ভোগের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা দেশের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের জনগণকে একখা উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়েছে।

যে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সে এলাকার জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কাজে। সরকার সমস্ত ব্যয় বহন করে নতুনভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। স্থানীয় জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে পরবর্তী সময়ে সরকারী রেজিস্ট্রেশন ও মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় জনগণের ভূমিকা প্রধান।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখা, বিদ্যালয়ের সম্পদ হেফাজত করা, শিক্ষকগণকে মর্যাদা দান করা, শিশুদের যথাযথ নিয়মে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো ও নিয়মিত উপস্থিত সুনিশ্চিত করা। বিদ্যালয়ের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রেখে শিশুদের পাঠ্যাভাস ও অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা অভিভাবকদের কর্তব্য।

জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এ আইন সফল করার জন্য জনগণকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তবেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দুরীভূত হবে এবং শিক্ষার আলোয় দেশ উদ্ভাসিত হবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বাস্তবায়নের জন্য শিশু জন্মের সঠিক রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। জনসাধারণ তাদের শিশুর সঠিক জন্ম তারিখ ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে/ পৌরসভার অফিসে লিপিবদ্ধ করবেন। তাছাড়া শিশু জরিপে সঠিক তথ্য প্রদান করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৯

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. "বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪" প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কী সুপারিশ করেছে?
   ক. ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
   খ. ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
   গ. ১৯৮০ সালের মধ্যে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করা
   ঘ. ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা

২. বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কবে পাস করা হয়?
   ক. ১৯৭৫ সালে
   খ. ১৯৮৫ সালে
   গ. ১৯৯০ সালে
   ঘ. ১৯৯৫ সালে

৩. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বয়স পরিধি কত?
   ক. ৫-৯ বছর
   খ. ৬-১১ বছর
   গ. ৪-৯ বছর
   ঘ. ৫-১০ বছর

আ) সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করুন।

১. স্থানীয় এলাকার শিশু জরিপ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি প্রধান কাজ।
২. জনগণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব।
৩. শিশু জরিপ কাজের সাফল্য অভিভাবকদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

ই) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
২. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

ঈ) ব্যবহারিক কাজ

১. সংযোজিত বাধ্যতামূলক আইনটি পড়ে স্থানীয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। গ, ৩। খ।

আ) ১। সত্য, ২। মিথ্যা, ৩। সত্য।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কার দায়িত্বে রয়েছে?
   - ক. শিক্ষামন্ত্রী
   - খ. শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
   - গ. মহাপরিচালক
   - ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. নিম্নের কোনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত?
   - ক. শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা
   - খ. বার্ষিক কর্মসূচি ও রুটিন প্রণয়ন করা
   - গ. মনোবিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান
   - ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

৩. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকার থেকে কোন খাতে অর্থ মঞ্জুরী পায়?
   - ক. আনুষঙ্গিক খাত
   - খ. উন্নয়ন খাত
   - গ. শিক্ষকদের বোনাস
   - ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের একটি ছক আঁকুন।

২. রেজিস্ট্রার ও নথিপত্র সংরক্ষণের কৌশলগুলো উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ও স্থানীয় জনগণের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। ঘ।

ইউনিট ৫

শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের সুশিক্ষা। প্রশাসনিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করা হয়। বিদ্যালয় মানুষ গড়ার কারখানা। এখানে প্রশাসনিক কাজ যথাযথভাবে পরিচালিত না হলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রশাসনিক কাজ নির্ভর করে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা, শ্রেণীকক্ষ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, শ্রেণীবিন্যাস, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও তাদের পারস্পরিক আচরণ ইত্যাদির উপর। সামগ্রিকভাবে এসব ব্যবস্থা এমন হবে যেন শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে ও আগ্রহের সাথে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষকও অনায়াসে বাধাহীন পরিবেশে একাগ্রচিত্তে শিক্ষাদান কাজ করতে পারেন। তাই শিক্ষক হিসেবে শ্রেণী পরিবেশকে কি করে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা এ ইউনিটে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, শ্রেণী বিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শ্রেণী পরিবেশ সম্পর্কে জানবো।

পাঠের সুবিধার জন্য এ ইউনিটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ-১ : শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-২ : শ্রেণী বিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি
পাঠ-৩ : শ্রেণী পরিবেশ

পাঠ - ১

শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা কাকে বলে তা বলতে পারবেন ।
- শ্রেণীসংগঠন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন ।

বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আমরা প্রাথমিক স্তরে শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে থাকি । বিদ্যালয়ের কার্যক্রমেরও বেশীরভাগ পরিচালিত হয় শ্রেণীকক্ষেই । তাই শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । যে কোনো কাজ করার জন্য সুন্দর, শান্ত, সুষ্ঠু পরিবেশ প্রয়োজন হয় । শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষাদান কাজের জন্য এ পরিবেশ প্রয়োজন। সুষ্ঠু শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ পরিবেশ তৈরি সম্ভব । তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা আবশ্যক ।

শ্রেণী সংগঠন

শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য ফলপ্রসূভাবে শিক্ষাদানের প্রয়োজন । আর তা করতে হলে যথাযথ শ্রেণী সংগঠনের দরকার । শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিচারে শ্রেণীকরণ ও দলগঠন করা যায় । আমাদের দেশে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের জন্য কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংগঠন করা হবে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার । শ্রেণী সংগঠনের জন্য সাধারণত যে বিষয়সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তা হলো–

বিবেচ্য বিষয়

- ফলপ্রসূ শ্রেণী শিখনের জন্য দল গঠন আবশ্যক । শ্রেণী শিক্ষণের সার্থকতা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোভাব ও মনযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে । দল গঠন করে কাজের সুষ্ঠু বিন্যাস শিক্ষার্থীকৈ একদিকে কাজে স্বতস্ফূর্ত করে তোলে অন্যদিকে সে পাঠে উৎসাহী হয়ে ওঠে ।
- সহ-শিক্ষাক্রম কার্যাবলীর জন্য দল গঠন করা প্রয়োজন । বিভিন্ন ধরনের কাজের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী শ্রেণী সংগঠন করা যায় । এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাস শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

এভাবে কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দল গঠন করাকে শ্রেণী সংগঠন বলা হয় ।

শ্রেণী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ কথা বুঝেছি যে, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শ্রেণী সংগঠন প্রয়োজন। শ্রেণী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপঃ

- শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য শ্রেণী সংগঠন প্রয়োজন। শিশু সমবয়সী, সম মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিশতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শিশুর বিকাশের জন্য এ ধরনের সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শ্রেণীর উপযোগিতা নির্ধারণের জন্য শ্রেণী সংগঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি শ্রেণী একটি সংগঠন। এদিক থেকে এক একটি শ্রেণী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতরাং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত একটি শ্রেণী সংগঠনের উপর আস্থা রাখা যায়।
- শিশু যখন একটি সংগঠনের সদস্য হয়ে কাজ করে তখন দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কাজের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে শিখে। দলের সদস্যরা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। এর ফলে শিশু নিজ যোগ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- সংগঠনের সদস্যদের বয়সের মিল থাকায় দলীয় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়।
- পারস্পরিক ভাব যোগাযোগ আদান প্রদানের মাধ্যমে শিশু নিজের অভাব পূরণে সমর্থ হয়, অন্যের অভাবও বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনে সাহায্য করতে শেখে।
- শিক্ষার্থী পারস্পরিক সাহচর্যে আনন্দ লাভ করে। শিশুরা মিশতে পছন্দ করে। ভাবের আদান প্রদান তাদের মানসিক গঠনের জন্য বিশেষ উপযোগী।
- সংগঠনের ফলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। একটি সংগঠনে বিভিন্ন পরিবারের শিশু থাকে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। পারস্পরিক বিনিময়ের ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে পরিচিত হয়।
- শিক্ষার্থী দলীয়ভাবে কাজ করে বলে অন্যের উপর আস্থা তৈরিতে অভ্যস্থ হয়। ফলে সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মকেন্দ্রিকতা দূর হয়।

শ্রেণী ব্যবস্থাপনা

শ্রেণী ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের প্রধানত দুটি দিকে নজর দিতে হবে। একটি হলো শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এবং অন্যটি হলো আচরণগত পরিবেশ। আমরা এ দু'ধরনের পরিবশকে অন্য নামেও উল্লেখ করি, যেমন– ভৌত পরিবেশ ও মানবীয় পরিবেশ। ভৌত পরিবেশ শ্রেণীকক্ষে পাঠ গ্রহণের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করে এবং মানবীয় পরিবেশে যথাযথ শিখন শেখা প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়। তাই শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পাঠ

উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে শ্রেণী ব্যবস্থাপনার বেশ গুরুত্ব লক্ষ্য রয়েছে। নিম্নে গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো–

গুরুত্ব

- শ্রেণী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় স্থান হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থী এখানে আনন্দময় পরিবেশ পায়, ফলে এখানে সে যা শেখে তা তার আচরণের পরিবর্তন ঘটায়।
- আধুনিককালে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী নিজ তাগিদে শিখবে এবং শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটির জন্য একটি সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশ প্রয়োজন। হৈচৈ, গণ্ডগোলময় স্থান এ প্রক্রিয়ার জন্য কখনই উপযুক্ত নয়।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ ও সাচ্ছন্দ যোগাযোগ গড়ে তুলতে শ্রেণী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ, মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সুষ্ঠু শ্রেণী ব্যবস্থাপনা এ সম্পর্কে উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে।
- শ্রেণী ব্যবস্থাপনা মনোবিজ্ঞান সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদান পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট আসনে, নির্দিষ্ট নিয়মে বসবে এবং শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট ধাপসমূহ অনুসরণ করবেন। এভাবে সুশৃঙ্খল শ্রেণী ব্যবস্থাপনা শ্রেণীকক্ষের পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে।
- মনোবিজ্ঞানসম্মত ও আকর্ষণীয় শ্রেণী ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। সঠিক বসার পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকের আন্তরিক ব্যবহার, খোলামেলা পরিবেশ শিশুকে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রাণবন্ত করে তোলে।
- শিক্ষকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন হয়। কাজের সময় হাতের কাছে উপকরণ পাওয়া, সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীর মানসিকতার সাথে পরিচিতি হওয়া, তার দুর্বলতা অনুসন্ধান করা, প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করা ইত্যাদি সকল কাজের জন্য সুস্থ মানসিক অবস্থার প্রয়োজন। উন্নত শ্রেণী ব্যবস্থাপনা এ মানসিক অবস্থা গঠনে সাহায্য করে।
- আকর্ষণীয় শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় মনোরম পরিবেশে শিক্ষার্থী কাজে আনন্দ পায়, সঠিক ফল লাভ করে ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ফলে শিক্ষার্থী উচ্ছল ও প্রাণবন্ত জীবনের অধিকারী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শ্রেণী সংগঠন প্রয়োজন কেন?
   ক. শিশুর বিকাশের জন্য
   খ. শিক্ষার্থীর আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করার জন্য
   গ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টির জন্য
   ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. পাঠদানের সময় বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহারের প্রধান কারণ কী?
   ক. বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তোলা
   খ. পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ সৃষ্টি করা
   গ. পাঠদানকে আধুনিক করে তোলা
   ঘ. শিক্ষকের কাজকে সহজ করা

আ) সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করুন

১. বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
২. শিক্ষাদানের জন্য দল গঠন শিক্ষার্থীদের পাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।
৩. সংগঠনের সদস্যদের মিল থাকায় দলীয় সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।

ই) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রতিটি শ্রেণী একটি ---------।
২. মানবীয় পরিবেশ -------- রক্ষার পথ করে দেয়।
৩. উন্নত শ্রেণী ব্যবস্থাপনা শিক্ষকের শিক্ষণ কাজের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত -------- তৈরিতে সাহায্য করে।

ঈ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণী সংগঠনের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?
২. “শিশুর সুস্থ বিকাশ শ্রেণী ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল”- এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। খ।
আ) ১। সত্য, ২। মিথ্যা, ৩। সত্য।
ই) ১। সংগঠন, ২। শৃঙ্খলা, ৩। পরিবেশ।

পাঠ - ২

শ্রেণী বিন্যাসের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বিন্যাস শনাক্ত করতে পারবেন ।
- এসব শ্রেণী বিন্যাসের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

আমরা পূর্বের পাঠে শ্রেণী সংগঠন ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি । শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন । শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার জন্য শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োজন । কাজেই শ্রেণী পরিচালনায় শ্রেণী বিন্যাসের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বিভিন্ন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা হয় । সাধারণত শিক্ষার্থী সংখ্যা, বিকাশের স্তর, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় । আপনারা এই পাঠে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য প্রণীত কয়েক ধরনের শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবেন ।

ব্লক টিচিং (Block Teaching)

একজন শিক্ষক সারা বছর একই শ্রেণীর সকল বিষয় পাঠদানের ব্যবস্থাকে ব্লক টিচিং বলা হয় । যেমন- ‘ক’ শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক হলে তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণীর বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, শারীরিক শিক্ষা, অঙ্কন, হাতের কাজ, ধর্ম ইত্যাদি সকল বিষয় পড়াবেন । তাছাড়া সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করবেন । প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, হাজিরা, অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান, পিতামাতার সাথে যোগাযোগ, পাঠোন্নতির বিবরণ, ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদির কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয় । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষক সব বিষয়ে পড়াতে পারেন বলেই ব্লক টিচিং চালু করা যায় । উপরের শ্রেণীতে একই শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয় পড়ানো সম্ভব নয় । এজন্য সেখানে ব্লক টিচিং এর ব্যবস্থা করা যায় না ।

ব্লক টিচিং এ সুবিধা হলো শিক্ষক সারা বছর একই শ্রেণীতে পাঠ দেন এজন্য ছাত্রচাত্রীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পান । ফলে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মধুর ও নিবিড় হয় । শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীর দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে ও শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে সুবিধা হয় । অন্যদিকে একজন শিক্ষক সকল বিষয়ে পারদর্শী হবেন এমন আশা করা যায় না । ফলে কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষকের দুর্বলতা শিশুদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায় । এ ছাড়াও প্রতিদিন একই শ্রেণীতে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষক একঘেয়ে ক্লান্তি অনুভব করেন । এসব সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করার পর দেখা যায় যে ব্লক টিচিং শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য । প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ব্লক টিচিং এর পরিবর্তে ক্লাস টিচিং অনেক বেশী উপযোগী ।

ক্লাস টিচিং (Class Teaching)

কোনো একটি শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষকের দ্বারা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে ক্লাস টিচিং বলা হয়। যেমন- পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। সাধারণত বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এ পদ্ধতিতে একজন বিষয় শিক্ষককে একাধিক শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হয়। প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে এ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় অন্যান্য শ্রেণীর বিষয়বস্তুর গভীরতা অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই এসব শ্রেণীতে এ পদ্ধতি চালু করা হয়।

ক্লাস টিচিং এর সুবিধা এই যে, বিষয় শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদান করেন। এর ফলে শিক্ষক বিষয় ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করার সময় বিষয়বস্তুর যে কোনো আঙ্গিকে আলোচনা করতে পারেন এবং ফলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান হয় সুস্পষ্ট ও স্থায়ী। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এর একটি বড় অসুবিধা হলো প্রতি বিষয়ের জন্য বার বার শিক্ষক পরিবর্তিত হন। ফলে শিক্ষার্থী কোনো শিক্ষককেই পুরোপুরি বুঝে উঠেতে পারে না। অপর দিকে শিক্ষকও অল্প সময় শিক্ষার্থীর সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে পারেন না। অথচ শিশুদের জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই প্রয়োজন। তবুও শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক গভীর ও স্পষ্ট জ্ঞানার্জনের কথা ভেবে ক্লাস টিচিং উপরের শ্রেণীসমূহের জন্য প্রযোজ্য।

মাল্টি গ্রেড টিচিং (Multigrade Teaching)

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। অনেক সময় দেখা যায় একই বিষয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ের পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। অনেকক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। এসব কারণে একটি শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে একজন শিক্ষক শ্রেণী পরিচালনা ও পাঠদানের ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এ পদ্ধতিকে মাল্টি গ্রেড চিটিং বলা হয়। এ পদ্ধতিকে শিক্ষক কয়েক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একত্রে একটি শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে পৃথক পৃথক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়ের উপর শিক্ষাদান করেন। যেমন- একজন শিক্ষক পঞ্চম, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একসাথে নিয়ে একটি শ্রেণী পরিচালনা করবেন। ধরা যাক, এই পিরিয়ডে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বিষয় বাংলা, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বিষয় পরিবেশ পরিচিতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত গণিত। শিক্ষক এ তিনটি শিক্ষার্থীদের পৃথকভাবে তাদের নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন এবং কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের সক্রিয় রাখবেন।

মাল্টি গ্রেড চিটিং এর সুবিধা হলো শিক্ষকের স্বল্পতার জন্য কোনো শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সময় ও মেধার অপচয় হয় না। আবার কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন বয়সী, বিভিন্ন যোগ্যতার ছেলেমেয়ে থাকলে তাদের জন্য কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব না হলে একজন বা দু'জন শিক্ষক মাল্টি গ্রেড টিচিং পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে পারেন। আবার একজন দক্ষ শিক্ষক একই শ্রেণীতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তার বিশেষ বিষয় যেমন গণিত, ইংরেজি বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। এ পদ্ধতিরও কিছু অসুবিধা আছে। যেমন- একই শ্রেণীতে বিভিন্ন

শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের একই বিষয়ে বা বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করতে হয় বলে শিক্ষকের পক্ষে অনেকক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পাঠদান সম্ভব হয় না।

আবার শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ শিক্ষক একদলের পাঠদান করার সময় অন্যদলসমূহ অমনোযোগী হতে পারে। পুনরায় মাল্টি গ্রেড টিচিং এর জন্য শিক্ষকের যথার্থ প্রস্তুতির অভাবেও এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস (Teaching in Over Crowded Class)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জনবহুল দেশের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যাকে শিক্ষাদানের জন্য অধুনা টিচিং ওভার ক্রাউডেড ক্লাস পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের একটি প্রকট সমস্যা। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এ সমস্যা বিদ্যমান। অনেক সময় একটি শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যাকে কয়েকটি শাখায় ভাগ করার পরও ছাত্র সংখ্যার অত্যাধিক চাপ নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। আবার শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রয়োজন অনুসারে ক্লাস চালু করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষামূলক ভাবে টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। এই ব্যবস্থায় শিক্ষক একটি বৃহৎ শ্রেণীতে প্রথমে সাধারণ পাঠ দিবেন, পরে পাঠের কঠিন অংশ বুঝাবার জন্য বৃহৎ শ্রেণীকে কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে পাঠ নেওয়া ব্যবস্থা নিতে পারেন। প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী একটি মিশ্র দল গঠন করে। প্রত্যেক দলকে পাঠের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নির্ধারিত কাজ দেওয়া যায়। শিক্ষক তার ব্যক্তিগত সুবিধা ও পছন্দ মতো দলকে তাদের কাজ প্রদর্শন করতে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। দলটি তাদের নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা যে কোনো একজনকে দিয়ে নির্ধারিত কাজ প্রদর্শন বা প্রশ্নে উত্তর দিতে পারে। তবে শিক্ষক এক্ষেত্রে এটুকু নিশ্চিত হবেন যে, দলের প্রতিনিধি প্রদত্ত উত্তর তাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফসল। এর জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের আলোচনা, কাজের ধারা, গতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবেন। একদলকে যাচাই করার পর তিনি অন্য একটি দলকে নির্দেশ দিতে পারেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দলকে তিনি পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষাদান, মূল্যায়ন ও পরামর্শ দান করতে পাারেন। দল গঠনের ফলে শ্রেণীর পরিসর অনেক ছোট হয়ে আসে।

প্রয়োগ

টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সুবিধা হলো এখানে শিক্ষক একযোগে একটি বৃহৎ শ্রেণীতে পড়াতে পারেন। বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে এবং শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শ্রেণী শিক্ষণ কাজ আকর্ষণীয় হয়। তবে ওভার ক্রাউডেড ক্লাসের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের প্রস্তুতি ও দক্ষতার উপর। এখানে উল্লেখ্য প্রাথমিক স্তরের শিশুরা নিজ প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে দলের যে সব শিশু চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। আবার শিক্ষাদান আকর্ষণীয় না হলে পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকবে না।

তবুও আমাদের দেশের জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে একই শ্রেণীতে অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষাদানের সমস্যা কিছুটা দূর করার জন্য টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে অনুসরণ করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. একজন শিক্ষক সারা বছর একই শ্রেণীতে সকল বিষয় পড়াবেন। এইরূপ বিন্যাসের নাম কী?
   - ক. ক্লাস টিচিং
   - খ. ব্লক টিচিং
   - গ. মাল্টি গ্রেড টিচিং
   - ঘ. টীম টিচিং

২. বিষয়ভিত্তিক সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োজন?
   - ক. ক্লাস টিচিং
   - খ. ব্লক টিচিং
   - গ. মাল্টি গ্রেড টিচিং
   - ঘ. টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস

৩. কোন সমস্যাটির দিকে লক্ষ্য রেখে টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কথা ভাবা যায়?
   - ক. শিক্ষকের স্বল্পতা
   - খ. বিষয় শিক্ষকের অভাব
   - গ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক
   - ঘ. শিক্ষার্থী সংখ্যায় আধিক্য

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত শ্রেণী বিন্যাসগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

২. ব্লক টিচিং এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।

৩. "টিচিং ইন ওভার ক্রাউডেড ক্লাস"– এইরূপ পরীক্ষণমূলক শ্রেণী বিন্যাস কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যকরী করা যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা তৈরি করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ।

পাঠ - ৩

শ্রেণী পরিবেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ➡ শ্রেণীকক্ষের পরিবেশগত উপাদান চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- ➡ শ্রেণী পরিবেশের প্রকারভেদ করতে পারবেন ।
- ➡ ভৌত ও মানবীয় পরিবেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- ➡ শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপযোগী পরিবেশ রক্ষার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন ।

শিশুর সর্বাঙ্গিন বিকাশের জন্য শুধু বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করলে চলে না । এর সঙ্গে কর্ম ও আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব দিতে হয় । এখানে আনুসাঙ্গিক বিভিন্ন উপাদান বলতে বই, খাতা, কলম, উপকরণ, সহপাঠী, শিক্ষক, শিক্ষকের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, মনোভাব, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষ, তার পরিধি ও অবস্থান, আসবাবপত্র, জানালা, দরজা, আবহাওয়া, সময় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসমূহকে বুঝায় । তাহলে বুঝতে পারছেন শিখন কাজ চলার সময় এসব উপাদান শিশু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করে । সুতরাং প্রত্যেকটি উপাদানের সুবিধা-অসুবিধা শিশুর শিখনের উপর কমবেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা প্রভাব বিস্তার করে ।

শিশুর শিখনের জন্য শ্রেণীগত উপাদানসমূহকে আমরা একসাথে শ্রেণী পরিবেশ বলে শনাক্ত করতে পারি । শ্রেণী পরিবেশের প্রভাব শিশুর বিকাশে যথেষ্ট কাজ করে বলেই এর উপর আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । শ্রেণী পরিবেশকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

- ভৌত পরিবেশ
- মানবীয় পরিবেশ

ভৌত পরিবেশ

ভৌত পরিবেশের মধ্যে শ্রেণীকক্ষ এবং শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিশুর শিখন সংক্রান্ত যেসব উপাদান ব্যবহার করে তাদেরকে বোঝায় । নিচে আপনারা এ ধরনের কয়েকটি উপাদানের সাথে পরিচিত হবেন ।

শ্রেণীকক্ষ

শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ১০ বর্গফুট মেঝে থাকা প্রয়োজন । শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষের আয়তন ছোট বড় হবে । এছাড়া শ্রেণীকক্ষ আয়তাকার হওয়া ভাল । প্রত্যেক কক্ষের সামনে পিছনে দুটি দরজা থাকবে । দরজা দু'টির মাঝখানে এবং বিপরীত দিকে দু'টি জানালা থাকবে । সাধারণত ব্ল্যাকবোর্ড যেখানে থাকবে তার বিপরীত দিকে জানালা না থাকাটাই সমীচীন ।

শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা এমনভাবে বসবে যেন তাদের বা দিক থেকে আলো আসে। ডান দিক থেকেও আলো আসলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু পিছন দিক থেকে আলো আসলে তাদের দেহের ছায়া বই বা খাতার উপর পড়বে। সামনের দিক থেকে আলো আসলে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হয়, অনেক সময় চোখের ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই শিক্ষকের দিকে মুখ করে বসবে। প্রাথমিক স্তরে শিশুরা অস্থির ও চঞ্চল প্রকৃতির হওয়া স্বাভাবিক। তারা একভাবে এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসতে পারে না। সে কারণে শিক্ষক একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে শিশুদের তদারক না করে শ্রেণীকক্ষের সর্বত্র ঘুরে প্রতি শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে দেখাশুনা করবেন। শিশুরা যে শুধুই সারি বেঁধে বসবে এমন নয় বরং মাঝে মাঝে ৩/৪ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদের মুখোমুখী করে গোলভাবে বসিয়ে দেয়া যায়। এভাবে বসলে শিশুরা পারস্পরিক আদান প্রদানে অভ্যস্থ হবে। মাঝে মাঝে দলের সদস্যদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ শ্রেণীর প্রত্যেকের সাথে শিশু সমানভাবে মিশবে এটাই কাম্য। তবে শিশুরা যেভাবেই বসুক না কেন শিক্ষক যখন কথা বলবেন বা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন তখন সকল শিশু যেন সমানভাবে শিক্ষক ও ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পায় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার নিয়ম শিক্ষক ঠিক করবেন।

আসবাবপত্র

শিক্ষার্থীদের বসার জন্য অবশ্যই চেয়ার, টেবিল বা বেঞ্চ অবা ডেস্কের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা কখনই মাদুর বা ফরাসে বসবে না। কারণ এভাবে বসলে শিক্ষার্থীকে শরীর বাঁকা করে বা ঝুঁকে কাজ করতে হয়। এতে একদিকে যেমন তার শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যহত হয়, অন্যদিকে ফরাসে আরাম করে বসলে শিশুর জড়তা আসে এবং সে অলস হয়ে পড়ে। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর বসার জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকা প্রয়োজন। যেমন- চেয়ার, বেঞ্চ, ডেস্ক ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী চেয়ার বা বেঞ্চ উচু নীচু হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য পৃথক চেয়ার থাকলে ভাল হয়। না হলে কমপক্ষে একটি বেঞ্চে দু'তিন জন ছাত্র বসতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এ ছাড়া শিক্ষকের জন্য একটি প্রশস্ত টেবিল এবং একটি আলমারী থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক স্তরে শিশুরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, চঞ্চলমতি। বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি করার জন্য শিক্ষককে নানা ধরনের আকর্ষণীয় ছবি, চার্ট, খেলনা বা অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এ উপকরণগুলো প্রতিদিন বহন করা শিক্ষকের জন্য কষ্টকর। তাই শ্রেণীকক্ষেই আলমারীতে তিনি এগুলো রাখতে পারেন। এছাড়া শিশুদের বাড়ির কাজের খাতা বা অন্যান্য বই পুস্তক তিনি এর মধ্যে রাখতে পারেন।

ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ

শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষক যেখানে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন তার বাম পার্শ্বে দরজার বিপরীত দিকে ব্ল্যাকবোর্ড রাখতে হবে। এ অবস্থায় ব্ল্যাকবোর্ডের উপর যথেষ্ট আলো পড়বে এবং এর যে কোনো কাজ শিক্ষার্থীদের দেখতে অসুবিধা হবে না। সাধারণত চক এবং ডাস্টার বোর্ডের নিচে বা পাশে বা এমন জায়গায় রাখবেন যাতে শিক্ষক সহজেই তা হাতের কাছে পান।

শ্রেণীকক্ষের দেয়াল শিশুদের পাঠের বিষয়বস্তু ভিত্তিক বা আকর্ষণীয় ছবি, চার্ট দিয়ে সাজানো যেতে পারে। শিক্ষণীয় যে কোনো পোস্টার বা কার্টুন বা ম্যাপও ঝুলান যেতে পারে। শিশুদের আঁকা ছবি বা তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য সমৃদ্ধ দেয়ালিকা শোভা বাড়িয়ে তোলে ও শিশুদের আনন্দ দেয়।

মানবীয় উপাদান

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে যেসব পদ্ধতি, কৌশল, পরিকল্পনা, নীতি ব্যবহার করা হয়, তাকে মানবীয় উপাদান বলে। আসুন কি ধরনের নিয়ম কানুন ও কৌশল ব্যবহার করলে আমরা শিশুকে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে পারব তা আলোচনা করি।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া

শ্রেণীকক্ষে যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হবে তা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সামর্থ, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ থাকবে না।

আকর্ষণীয় উপায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা

বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী আকর্ষণীয় শিক্ষাদান কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপকরণ বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীকে কৌতূহলী করতে তোলে এবং পাঠে তার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে।

শিশুদের সব সময় কাজে নিয়োজিত রাখা

প্রাথমিক স্তরে শিশুরা অস্থির প্রকৃতির। তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সবসময়ই সে কিছু না কিছু করতে চায়। কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে তারা দুষ্টুমি বা গোলমাল করা থেকে বিরত থাকে। এ কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

কিছু সময়ের জন্য পাঠ স্থগিত রাখা

শিশুরা একটি বিষয়ের প্রতি বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। এ কারণে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আলোচনা করতে করতে শিশুদের মনোযোগ হারিয়ে ফেলার আগেই বিষয়বস্তু থেকে বাইরে কোনো বিনোদনমূলক আলোচনা বা গল্প বলা বা শিক্ষার্থীদের খেলার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর এই কিছুক্ষণ অবসর তাকে পাঠে নতুন করে মনোযোগী করে তুলতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কাজের মাঝে মাঝে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু ভিত্তিক প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিশু পাঠে কতটুকু মনোযোগী বা কতখানি আগ্রহী তা শিক্ষক সহজেই যাচাই করতে পারেন। সেই সাথে শিশুও প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে উৎসাহী হয় অথবা না পারলে শিক্ষক তার দুর্বলতা দূর করতে সচেষ্ট হতে পারেন।

শৃঙ্খলা

পাঠদানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা খুবই জরুরী। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হবেন। অযথা গোলমাল করা বা পাঠ বহিভূত কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা নষ্ট করে। শিশুরা শৃঙ্খলা বহির্ভূত কাজ করবেই কিন্তু একজন শিশু করলে সব শিশুরাই তা করতে ইচ্ছা করে। এভাবে শ্রেণী পরিবেশ নষ্ট হবে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

শিক্ষকের সহানুভূতিশীল আচরণ

শিক্ষক সহানুভূতির সাথে শিক্ষার্থীকে শিখন কাজে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থী শিশু পারিবারিক স্নেহ বন্ধন থেকে সে মাত্র বাইরে এসেছে। পূর্ণ সহানুভূতি স্নেহ ভালবাসা ছাড়া সে কখনই শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে একাত্ম বোধ করবে না। শিক্ষককে এ বিষয়টি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং শিশুর প্রতি তিনি সব সময় সদয় আচরণ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন । (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শ্রেণীকক্ষে অনুসৃত আকর্ষণীয় পাঠ নিচের কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায়?
   ক. মানবীয় পরিবেশ
   খ. ভৌত পরিবেশ
   গ. প্রাকৃতিক পরিবেশ
   ঘ. সামাজিক পরিবেশ

২. প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষে কতটুকু স্থান দরকার?
   ক. ১৫ বর্গফুট
   খ. ১০ বর্গফুট
   গ. ৫ বর্গফুট
   ঘ. ২০ বর্গফুট

৩. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার জন্য কোন ধরনের আসবাবপত্র/উপকরণ স্বাস্থ্যসম্মত?
   ক. বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার
   খ. পাটি
   গ. মাদুর
   ঘ. শতরঞ্জি

৪. নিচের কোনটি মানবীয় পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. আকর্ষণীয় উপায়ে পাঠদান
   খ. শিশুদের আগ্রহের প্রতি গুরুত্ব
   গ. রঙ্গিন চকের ব্যবহার
   ঘ. পাঠের মাঝে স্বল্প বিরতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভৌত ও মানবীয় পরিবেশের সংজ্ঞা লিখুন ।
২. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য কীরূপ বসার ব্যবস্থা করবেন?
৩. শ্রেণীকক্ষে পাঠের কী ধরনের মানবীয় পরিবেশ গড়ে তোলা যায়– তার একটি রূপরেখা তৈরি করুন ।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। ক, ৪। গ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শ্রেণী শিখনের সার্থকতা নির্ভর করে–
   ক. ফলপ্রসূ দল গঠনের উপর
   খ. বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর
   গ. শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষার উপর
   ঘ. শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টির উপর

২. পাঠের কোন পর্যায়ে ক্লাস টিচিং সুবিধাজনক?
   ক. শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর আধিক্য
   খ. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান
   গ. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক
   ঘ. শিক্ষকের স্বল্পতা

৩. শ্রেণীকক্ষের মানবীয় পরিবেশ তৈরি করার জন্য কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?
   ক. রঙিন চকের ব্যবহার
   খ. পাঠের মাঝে অল্প বিরতি
   গ. আকর্ষণীয় উপায়ে পাঠদান
   ঘ. শিশুদের আগ্রহের প্রতি গুরুত্ব

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণী সংগঠনের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?
২. শ্রেণী পরিবেশের মানবীয় উপাদান বলতে কী বুঝেন?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। খ, ৩। ঘ।

ইউনিট ৬

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ভূমিকা

শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় ও শিক্ষাক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাক্রম যতই আধুনিক হউক, শিক্ষক যত সুপণ্ডিতই হউক, বিদ্যালয় পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা যতই সুন্দর হোক শিক্ষক যদি শ্রেণী শিক্ষণ শিখনে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করেন তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষকতা পেশায় যারা নিয়োজিত আছেন তাঁরা যেন সঠিক পদ্ধতি ও কলাকৌশল রপ্ত করে বিজ্ঞানসম্মত ও আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন সেদিকে বিবেচনা করে শিক্ষাদান পদ্ধতির এ মড্যুলটি রচিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটে ৯টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ-১ : শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের অর্থ, সংজ্ঞা, পার্থক্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-২ : বক্তৃতা পদ্ধতি
পাঠ-৩ : আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
পাঠ-৪ : প্রদর্শন ও পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি
পাঠ-৫ : পর্যবেক্ষন, পরীক্ষণ ও প্রজেক্ট পদ্ধতি
পাঠ-৬ : অভিনয় ও শিক্ষাভ্রমণ পদ্ধতি
পাঠ-৭ : কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি
পাঠ-৮ : মন্তেসরি পদ্ধতি
পাঠ-৯ : কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি

পাঠ - ১

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের অর্থ, সংজ্ঞা, পার্থক্য ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন ।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন ।
- আধুনিক যুগে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতিগুলোর নাম বলতে ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের অর্থ, সংজ্ঞা ও পার্থক্য

যে কোনো পাঠ পড়াতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে বিষয়বস্তুটি কি, কাদেরকে পড়াতে হবে অর্থাৎ কোন শ্রেণীর উপযোগী, পাঠের উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে হবে, কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে ইত্যাদি । এ সব কিছু চিন্তা করে যখন একজন শিক্ষক প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণীকক্ষে যান তখন তিনি পাঠের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সার্থকভাবে শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন । তবে এর জন্য প্রয়োজন হয় নানা রকমের শিক্ষণ পদ্ধতি ও কলাকৌশলের । এসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষক বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষার্থীর মনের একটি যোগসূত্র ঘটিয়ে তাকে শিখনের কাজে সহায়তা করেন । আমরা অনেকেই জেনে ও না জেনে শ্রেণীকক্ষে বিভিন্নভাবে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করি । কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে আমরা কোনো না পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করি । কখনও বই পড়তে দিয়ে, কখনও বক্তৃতা দিয়ে, কখনও প্রশ্নোত্তর ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে, কখনও হাতে কলমে কাজ করিয়ে শ্রেণীতে পাঠ উপস্থাপন করি । এসবই পদ্ধতি । কাজেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করানো ও তাকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষক যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাই শিক্ষন পদ্ধতি । অর্থাৎ শিক্ষণ পদ্ধতিকে শিক্ষকের এক ধরনের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক অর্থে এই কৌশল ও পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কৌশল পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত । শিক্ষক কিভাবে ও কি রীতি অনুসরণ করবেন তাকেই কৌশল বলা যায় । যেমন- নতুন বিষয়টির জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা, স্পষ্টভাবে সঠিক উচ্চারণ কথা বলা, উপযুক্ত ও কার্যকরী উপকরণের ব্যবহার করা, বৈচিত্রপূর্ণ প্রশ্ন করা, পাঠের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বিষয়বস্তু অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের উঠানামা করা, অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহার করা, প্রাসঙ্গিক গল্প বলা, উদাহরণ দেওয়া, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা । এসবই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত । এ কৌশলগুলো শিক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে সহায়তা করে । তবে সব কৌশলই যে সব পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তা নয়। তাই পাঠের বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোনো পদ্ধতিতে কোনো কৌশল শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে তাও বিচার করা দরকার । তাই কতগুলো কৌশলের সমবায়েই পদ্ধতি হয় না, পদ্ধতি হলো

উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষক যদি উদ্দেশ্য অনুযায়ী কৌশলগুলো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রকারভেদ

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি

শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়– শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে যদি শিক্ষকের ভূমিকা মূখ্য হয় অর্থাৎ শিক্ষকই অধিকাংশ সময়ে নিজে সক্রিয় থেকে এবং শিশুদেরকে নীরব শ্রোতা ও দর্শকের ভূমিকায় রেখে পঠন পাঠন কার্যক্রমকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন তখন সে পদ্ধতিকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে শিক্ষকগণ শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন। শিশুদের মনমানসিকতা, বুদ্ধি, সামর্থ্য ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে এবং তাকে সক্রিয়তার মধ্যে রেখে শিক্ষায় তার অংশগ্রহণে নিশ্চিত করার কথা শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেউ ভাবতনা। শিক্ষার্থীরা কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে, সম্ভাব্য প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করত। তাই শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি বলা হয়।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক

আধুনিককালে এই শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সব আয়োজন শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীর বয়স, মনমানসিকতা, সামর্থ্য, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে, হাতেকলমে কাজ করিয়ে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার সক্রিয় শিখনে সহায়তা করেন। পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক শুধুমাত্র নিজেই তাত্ত্বিক জ্ঞান বা তথ্য সরবরাহ করেন না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে শিশুর কাছ থেকেই তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেন এবং তাকে জানা থেকে অজানার দিকে নিয়ে যান। তাদেরকে দলগত ও ব্যক্তিগত কাজ দিয়ে শিখনে সহায়তা করেন। তাই বলা যায় যে পদ্ধতিতে শিশুর বয়স, মেধা, সামর্থ্য, রুচি, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, আবেগ ও প্রবণতার কথা চিন্তা করে এবং শিশুকে সক্রিয়তার মধ্যে রেখে তার শিখনে সহায়তা করা হয় তা হলো শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতি বা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় শিশু বা শিক্ষার্থীর ভূমিকা মূখ্য, শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ।

পরবর্তী পাঠগুলোতে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বক্তৃতা ও প্রদর্শন পদ্ধতিকে যদিও সনাতন বা শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তথাপি আধুনিককালে এসব পদ্ধতিকে নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করে কিভাবে কার্যকরী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কারণ আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা, সীমিত পাঠের সময় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপকরণ না থাকায় এসব পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতি হলেও এটিকে শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা যায় না। কারণ এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সমানভাবে সক্রিয় থাকে।

আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রজেক্ট, ভূমিকাভিনয়, শিক্ষা ভ্রমণ, কিণ্ডার গার্টেন ও মন্টেসরী পদ্ধতিকে আধুনিক ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হলেও কোনোটিকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি বলা যায় না। একটি পদ্ধতির উপর অন্য পদ্ধতির প্রভাব প্রায়ই দেখা যায়। আবার সব পদ্ধতিরই কিছু বিশেষ সুবিধা ও ত্রুটি রয়েছে। সেজন্য বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আবার বিশেষ একটি পদ্ধতিতে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে

একই পাঠে বিভিন্ন ধারণা গড়ে তোলার জন্য একাধিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে তিনি দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা বিচার করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন এবং সার্থকভাবে শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী?
   - ক. পদ্ধতি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত
   - খ. কৌশল পদ্ধতিকে সহজ করে
   - গ. একে অপরের পরিপূরক
   - ঘ. পদ্ধতি ও কৌশলে মূলত কোনো পার্থক্য নেই

২. কোনটি সনাতন পদ্ধতি?
   - ক. বক্তৃতা
   - খ. পরীক্ষণ
   - গ. প্রদর্শন
   - ঘ. পর্যবেক্ষণ

৩. কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখনে অংশগ্রহণ করে?
   - ক. বক্তৃতা
   - খ. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি
   - গ. পর্যবেক্ষণ
   - ঘ. ডেমনস্ট্রেশন

৪. কোনটি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত নয়?
   - ক. গল্প বলা
   - খ. উপকরণের ব্যবহার করা
   - গ. বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রশ্ন করা
   - ঘ. বক্তৃতা

৫. আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক?
   - ক. শিক্ষক সক্রিয় শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়
   - খ. শিক্ষক নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী সক্রিয়
   - গ. শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শক
   - ঘ. শিক্ষক সাহায্যকারী ভূমিকায় এবং শিক্ষার্থী সক্রিয়

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বুঝায়? এগুলোর পার্থক্য বলুন।

২. শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রকারভেদ উল্লেখ করুন এবং উদাহরণ দিন।

৩. আধুনিককালে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতিগুলোর জনপ্রিয়তার কারণ কী?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। ঘ।

পাঠ - ২

বক্তৃতা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বক্তৃতা পদ্ধতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন ।
- বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন ।
- বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বক্তৃতা পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করার উপায়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- শ্রেণীকক্ষে সার্থকভাবে বক্তৃতা পদ্ধতির কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন ।

বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োগ

যে পদ্ধতিতে শিক্ষক সীমিত সময়ে নিজেই মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন তাকে বক্তৃতা পদ্ধতি বলে । এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় বক্তা এবং শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসেবে থাকে । শিক্ষকের একমাত্র বিবেচনার বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ শেষ করা । তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা অর্থাৎ তার বয়স, মেধা, আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা এগুলোর কথা কখনও বিবেচনা করেন না । ফলে শিশুরা বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ হারায় ও অমনোযোগী হয়ে পড়ে ।

বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োগ

প্রাথমিক স্তরের শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল প্রকৃতির । চুপচাপ বসে থাকতে পারে না । খেলাধুলা ও নানা কাজের মধ্যে থাকতে ভালবাসে । তাই এ স্তরের জন্য শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতি মোটেও উপযোগী নয় । কিন্তু পাঠ উপস্থাপনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । যেমন–

- পূর্বদিকের পাঠের আলোচনা প্রসঙ্গে কিংবা নতুন পাঠের ভূমিকায়;
- জটিল বা তাত্ত্বিক পাঠ যা পরীক্ষা করে দেখানো সম্ভব নয়, এমন সব পাঠ;
- কোনো কিছু প্রদর্শন করার আগে বা পরে;
- শিক্ষা বিষয়ক কোনো নির্দেশনা দেবার সময় ।

অনেক সময় আমাদের দেশে শিক্ষকগণ নিচের কারণগুলোর জন্য শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করেন । এগুলো হলো–

- প্রতিটি শ্রেণীতে অধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা ।
- মাত্র ৩০ মিনিটের এক একটি পিরিয়ড । এত কম সময়ে কোনো কোনো পাঠ শেষ করতে গেলে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না ।
- মেধা ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ।
- শিশুদের সক্রিয়তা ও আনন্দের মধ্যে রেখে পাঠ উপস্থাপনে কিছু কিছু শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ।

এছাড়া বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানের কিছু কিছু সুবিধাও রয়েছে । আসুন এগুলো জানার চেষ্টা করি ।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে অধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং অল্প সময়ে অনেক কিছু পড়াতে পারেন।
- যেহেতু এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করতে হয়, তাই এখানে প্রদর্শনের জন্য কোনো উপকরণ বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। এ কারণে এ পদ্ধতিতে খরচের ঝামেলা নেই।
- বর্ণনামূলক পাঠের জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা

- পাঠ চলাকালীন সময়ে শিশুদের নানাভাবে সক্রিয় রাখা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দিক। আনন্দঘন পরিবেশে শিশুরা যে কোনো কাজে আগ্রহী ও মনোযোগী হয়। ফলে শিশুদের শিখন সহজ, ত্বরান্বিত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিশুদের অভিজ্ঞতা কোনোা কিংবা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর বিনিময়ের সুযোগ নেই। এখানে শিশুকে কাজের মধ্যে রেখে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নেই। শিশু নীরব শ্রোতা হিসেবে থাকে। এ পদ্ধতিতে শিশুর অভিজ্ঞতা, মেধা, চাহিদা, সামর্থ এগুলোর প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে এটি একটি অমনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
- বক্তৃতা পদ্ধতি একমুখী হওয়ায় শিশুরা কোনো কিছু না বুঝলে বা তাদের কৌতূহলী মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায় না। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের উপযুক্ত ধারণা গড়ে উঠে না, শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং শিশুদের মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না।
- যেহেতু শিক্ষার্থী কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারেনা, তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায় না।
- বক্তৃতা পদ্ধতি পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষকের মধ্যে উপকরণ তৈরি বা ব্যবহারের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ব্যহত হয়।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করতে হলে শ্রেণীতে কঠোর শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় শিক্ষক কঠোর মনোভাব নিয়ে পাঠ উপস্থাপন করেন। ফলে শিশুদের কাছে শিক্ষক অপ্রিয় হয়ে উঠেন। কাজেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক আশানুরূপ হয় না।
- পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও গলার স্বরে যদি চমৎকারিত্ব, নাটকীয়তা, নতুনত্ব, আবেগ ও মাধুর্য না থাকে তাহলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিশুর আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে না।

বক্তৃতা পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলার উপায়

বক্তৃতা পদ্ধতিকে সার্থকভাবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার ও কার্যকরী করতে হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার−

- পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।
- সতর্কতার সাথে সহজ, সরল ও স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে হবে।
- শিক্ষকের প্রকাশভঙ্গী আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। বক্তব্য উপস্থাপনার সময় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর বিনিময়, ব্যাখ্যা প্রদান, উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার, অভিনয়, বিষয়বস্তুর চিত্রধর্মী বর্ণনা, ইত্যাদির কৌশল শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করে তোলে এবং শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- শিক্ষকের মৌখিক বক্তব্য বা বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবং বিষয়বস্তুগত ধারণাকে পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং বোর্ডের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এতে শিক্ষাথীর মনে একঘেয়েমী, অবসাদ, ক্লান্তি, বিরক্তি ও অমনোযোগিতার সৃষ্টি হবে না। শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও সফল হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. বক্তৃতা পদ্ধতিতে কার ভূমিকা মূখ্য?
 ক. শিক্ষক
 খ. শিক্ষার্থী
 গ. দলনেতা
 ঘ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

২. বক্তৃতা পদ্ধতির সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে?
 ক. বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের দখল
 খ. শিক্ষার্থীর আগ্রহ
 গ. শিক্ষকের বক্তৃতাদানের কলাকৌশল প্রয়োগের উপর
 ঘ. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি

৩. শিক্ষার্থীর মনে একঘেয়েমী, অবসাদ, ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি করে কোনটি?
 ক. শিক্ষকের একটানা বক্তৃতা
 খ. পাঠসহায়ক উপকরণের ব্যবহার
 গ. অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার
 ঘ. বক্তব্য উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা

৪. বক্তৃতা পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা কোনটি?
 ক. বিদ্যালয়ের দুর্বল অর্থনীতি
 খ. অধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা
 গ. যন্ত্রপাতি ও শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করতে হয় না
 ঘ. কম সময়ে অধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান

৫. বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা কী?
 ক. দর্শক
 খ. বক্তা
 গ. সক্রিয় দর্শক ও শ্রোতা
 ঘ. নীরব ও নিষ্ক্রিয় শ্রোতা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বক্তৃতা পদ্ধতির তিনটি সুবিধা লিখুন।
২. বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলো কী?
৩. এ পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলার উপায়গুলো কী?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ, ৫। ঘ।

পাঠ - ৩

প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কাকে বলে তা বলতে পারবেন ।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন ।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধাগুলো বলতে পারবেন ।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধাগুলো বলতে পারবেন ।
- আলোচনা পদ্ধতি কাকে বলে তা বলতে পারবেন ।
- আলোচনা পদ্ধতি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন ।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

কোনো পাঠের মূল বক্তব্যকে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করাকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বলে । এ পদ্ধতিতে আলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয় । কখনও কখনও শিক্ষার্থীরা নিজেরাও প্রশ্ন করে । এভাবে প্রশ্নের উত্তর শুনে শিক্ষার্থীরা পাঠের মূল বক্তব্য অনুধাবনে সচেষ্ট হয় । কোনো প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীরা জানা না থাকলে শিক্ষক নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেন । পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিয়ে তাদের শিখন প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে সাহায্য করেন । তবে এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের উপর । প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয় । এ কারণে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একঘেয়েমী, বিরক্তি, অমনোযোগিতা এসব বিষয়ের উদ্ভব হওয়ার সুযোগ কম থাকে । শ্রেণীকক্ষে এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষককে পূর্বপ্রস্তুতি ও পাঠের পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় । পাঠের সফল বাস্তবায়নের জন্য কোনো পাঠে কি প্রশ্ন করতে হবে, কি কি উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে এ সম্পর্কে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই প্রস্তুতি নিতে হয় ।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সক্রিয় থাকে । ফলে উভয়ের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় সকলে প্রানবন্ত হয়ে উঠে । পাঠের কোনো অংশ জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হলে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর সমাধান জেনে নিতে পারে । শিক্ষকও প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর পারগতা যাচাই করে নিতে পারেন । এ পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী ও শিখনে তৎপর থাকে, তাদের ভাষাবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে ।

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির মৌলিক নীতি যেমন জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত ইত্যাদি অনুসরণ করে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহযোগিতা করতে পারেন।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও মুক্তচিন্তার সুযোগ করে দিতে পারেন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থী মনোযোগী কি না বা তারা পাঠ অনুধাবন অনুসরণ করতে পারছে কি না তা শিক্ষক জানতে পারেন এবং নিজের অবস্থান জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে পারেন।
- এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষক উপকরণ ব্যবহার করায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, উদ্দীপণা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা

- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে না পারলে পাঠের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। এলোমেলো প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মনে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।
- সঠিকভাবে ও সুচিন্তিতভাবে প্রশ্ন করতে না পারলে মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে অবান্তর বিষয়বস্তুর অবতারণা হতে পারে। এ অবস্থায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।
- এ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত প্রশ্ন শিক্ষার্থীর উপযোগী না হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ হলে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমে যাবে। আবার প্রশ্ন খুব কঠিন বা জটিল হলে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না কিংবা শিক্ষার্থী বিব্রত বোধ করবে।
- এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষ হতে হয়। তিনি যদি উৎকৃষ্ট মানের প্রশ্ন তৈরি করতে না পারেন এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের মোকাবেলা করার সামর্থ তার না থাকে তাহলে শিক্ষক সফলতার সাথে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন না।
- উপযুক্ত পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায়

- সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- সমস্ত বিষয়বস্তুর উপর ধারাবাহিকভাবে প্রশ্ন করতে হবে।
- সহজ, সরল ও স্পষ্ট উচ্চারণে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্ন করতে হবে।
- শ্রেণীকক্ষের সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্ন ঘোষণার পর উত্তর কি হবে সে সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে। এতে সকল শিক্ষার্থীই সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করবে। এরপর একজন শিক্ষার্থীকে উত্তর দেয়ার জন্য বলা যেতে পারে।

- চিন্তার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা আসে এ ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। যেমন– কি, কোথায়, কেন, কিভাবে ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হবে। ‘হ্যাঁ’, ‘না’ জবাব আসে এ ধরনের প্রশ্ন পরিহার করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স, অভিজ্ঞতা, মেধা, ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রশ্ন করতে হবে।
- কোনো শিক্ষার্থীর ভুল উত্তরের জন্য এমন কিছু করা ঠিক নয় যেন শিক্ষার্থী লজ্জিত হয়। তবে সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশংসিত করার জন্য ‘সাবাস’, ‘বেশ ভাল’, ‘ঠিক বলেছ’ ইত্যাদি বলে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- প্রশ্ন অনুসারে যথাযথ উত্তর দেবার কৌশল শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু সঠিক উত্তরের সাথে যেন না মিশিয়ে ফেলে তাও জানানো দরকার।

আলোচনা পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন দু’ভাবে হতে পারে। প্রথমত শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীদের সকলকে একটি দল ধরে নিয়ে কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিতে পারেন বা সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে এর কারণ চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত শিক্ষক মেধাসম্পন্ন, মাঝারি ও নিম্নমেধার শিক্ষার্থীদেরকে মিলিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিতে পারেন। প্রত্যেক দল পাঠ্যবিষয়ের কোনো অংশ বা সমস্যা সম্পর্কে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিষয় বা সমস্যার সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি বসে স্বাধীনভাবে আলোচনা করে। আলোচনাকালে কোনো জটিল সমস্যার বা মত পার্থক্যের উদ্ভব হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরামর্শ বা সহায়তা নিয়ে সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। আলোচনা পদ্ধতিতে দলগত কাজ শেষে দলনেতা আলোচনার বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে উপস্থাপন করতে পারে। এরপর এ প্রতিবেদন নিয়ে পুনরায় আলোচনা হতে পারে। এভাবে প্রতিটি দলের প্রতিবেদনের উপর সমস্ত ক্লাসে আলোচনা হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির মূল কথা হলো সকল শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা। এ পদ্ধতিকে স্বশিখন পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। কারণ আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পাঠ্যবই, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বই ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে তথ্য জেনে নেয়। তবে এ সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনে আগেই শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মূখ্য। শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, সৃজনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি হলো আলোচনা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকের ভূমিকা শুধুমাত্র একজন সাহায্যকারী বা পথ প্রদর্শকের। সুতরাং এখানে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় বলে নিজস্ব চিন্তা ও বিচার শক্তির বিকাশ ঘটে ও তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।
- আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকলে তা শুধরে নিতে পারে।
- আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে শিখন হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- দলে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।
- সকলেই সক্রিয়তার মধ্যে থাকে বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা

- প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এ পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- মাত্র ২৫-৩০ মিনিট সময়ের জন্য আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে ⓚ বৃত্তায়িত করুন)

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি সবচেয়ে সঠিক?
   ক. শিক্ষক প্রশ্ন করেন শিক্ষার্থী উত্তর দেয়
   খ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে শিক্ষক উত্তর দেন
   গ. শিক্ষার্থীর ভূমিকা সক্রিয় শিক্ষক নিষ্ক্রিয়
   ঘ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সমানভাবে সক্রিয় থাকে

২. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনে একজন দক্ষ শিক্ষকের কোন দিকে বেশি লক্ষ্য করা প্রয়োজন?
   ক. বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করা
   খ. যে কোনো প্রশ্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করা
   গ. শিক্ষার্থীর উপযোগী প্রশ্ন করে যুক্তিতর্ক ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ করে দেওয়া
   ঘ. মেধাবী শিক্ষার্থীদের জটিল ও দূর্বোধ্য প্রশ্ন করা

৩. কোন পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষাবৃত্তীয় দক্ষতা, যুক্তিতর্ক ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটে?
   ক. বক্তৃতা পদ্ধতি
   খ. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি
   গ. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পদ্ধতি
   ঘ. আলোচনা পদ্ধতি

৪. আলোচনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে কোনটি প্রয়োজন?
   ক. সকল শিক্ষার্থীর আলোচনায় অংশগ্রহণ
   খ. মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা
   গ. শিক্ষকের অগ্রণী ভূমিকা
   ঘ. দলনেতার অগ্রণী ভূমিকা

৫. আলোচনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
   ক. আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন নেই
   খ. শিক্ষকের দায়িত্ব একজন পথ প্রদর্শক হিসেবে
   গ. প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগী নয়
   ঘ. প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা একসাথে চালানো

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির ৪টি সুবিধা ও ৪টি অসুবিধা লিখুন।

২. আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে কোন কোন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার?

৩. আলোচনা পদ্ধতির ৫টি সুবিধা ও ২টি অসুবিধা লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ক, ৫। ঘ।

পাঠ - ৪

প্রদর্শন ও পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রদর্শন পদ্ধতি কি তা বলতে পারবেন ।
- প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি কি তা বলতে পারবেন ।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধাগুলো বলতে পারবেন ।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের কয়েকটি অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিকে অধিক কার্যকরী করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

প্রদর্শন পদ্ধতি

সংজ্ঞা

যে পদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠের যে কোনো বিষয়, ঘটনা, তত্ত্ব ও তথ্য বাস্তবে, কোনো উপকরণের সাহায্যে বা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন তাকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে । শিক্ষক নিজেই এবং কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সাজিয়ে প্রদর্শন ও পরীক্ষণ করে দেখান ।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উত্তর দেয় । এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিষয়বস্তু অনুধাবনের চেষ্টা করে । তারা সব সময় সক্রিয় শ্রোতা, দর্শক বা কেন কোনো সময় উৎসুক অংশগ্রহণকারী । শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে যা বলা হচ্ছে বা ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা, নোট নেওয়া, প্রয়োজনীয় চিত্র অংকন করা ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ।

শিক্ষকের ভূমিকা

প্রদর্শন পদ্ধতিতে যদিও শিক্ষক প্রদর্শক, বক্তা ও উপস্থাপক সেদিকে দিয়ে বিচার করলে এটি একটি শিক্ষককেন্দ্রিক ও সনাতন পদ্ধতি, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এটি সম্পূর্ণ শিক্ষককেন্দ্রিক নয় । প্রদর্শনকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু উপলব্ধির জন্য সহযোগিতা করেন । প্রতিটি ধাপে কি ঘটে তা ব্যাখ্যা করেন । প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে বিষয়টি তারা অনুধাবন করতে পারলো কি না তা বুঝে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হন । শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় থাকে ।

যে কোনো বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকরী । বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জনে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী । আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি । কখনও কখনও হাতে কলমে কাজ করে শিখনে সহায়তার জন্য সকল শিক্ষার্থীক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না । কখন কখনও এগুলো এত দামী বা বিপদজনক হয় যে শিক্ষককে তখন প্রদর্শন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় । তাই বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির অবদান অপরিসীম ।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষকের জন্য একটি মাত্র উপকরণ বা একসেট যন্ত্রপাতি হলেই চলে। শিক্ষক নিজে উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সীমিত সময়ে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারেন।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত হয়। কারণ এখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। শ্রেণীর সকলেই একত্রে চোখ, কান ও মনকে সজাগ রেখে বিষয়বস্তু অনুধাবন, সংজ্ঞা নির্ণয়, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করে।

যদি সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যায় এবং শ্রেণী উপযোগী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তাহলে এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। এখানে ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে।

- এ পদ্ধতিতে বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্লাশে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে পরীক্ষা না করলেও তাদের নানা রকমের ছক, ছবি ও গ্রাফ ইত্যাদি আঁকতে হয়। ফলে তাদের অঙ্কনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে, কখনও কখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিমূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা উৎসাহের সাথে শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। তারা যন্ত্রপাতি সাজাতে, উপকরণ ধরতে, এগিয়ে দিতে, প্রয়োজনমত ছোট খাট পরীক্ষা প্রদর্শন করতেও পারে। তাই শিক্ষকের প্রাধান্য থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা

- পাঠ চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশ এবং পরীক্ষা চলাকালীন প্রত্যেকটি ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া ইত্যাদি ভালভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। কিন্তু শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা অধিক বলে প্রদর্শন পদ্ধতিতে এ সুযোগ খুবই কম। সকলে সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেনা।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী অনেক সময় কোনো কিছু দূর থেকে দেখে বা শুনে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনা। উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু উপলব্ধি করতে না পারলে শিক্ষার্থীর পরীক্ষণমূলক দক্ষতাও বৃদ্ধি পায় না।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও মানসিক যোগ্যতার প্রতি গুরুত্ব দিতে পারেন না। কারণ অনেক উৎসাহী শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন। আবার সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ করতে হলে অনেক সময় শিক্ষক

দ্রুত উপকরণের ব্যবহার কিংবা পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। যার জন্য শিক্ষার্থী অনেক কিছুই ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেনা।

প্রদর্শন পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায়

এ পদ্ধতিকে সনাতন শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হলেও আমাদের বিদ্যালয়ের দুর্বল অর্থনীতি, অধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা, উপকরণ ও যন্ত্রপাতির স্বল্পতা ও প্রতিটি পিরিয়ডের সীমিত সময়ের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি বিষয়েই কোনো কোনো পাঠের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষায় এ পদ্ধতির ব্যবহার ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে অসুবিধাগুলো সাধ্যমত দূর করা দরকার। যেমন–

- শিক্ষকের প্রদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। কোনো বিশেষ বিষয়বস্তু এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা উচিত এবং সম্ভব কি না তা শিক্ষককে ভেবে দেখতে হবে।
- প্রদর্শন যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষকের এমন কিছু করা উচিত নয় যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ ব্যাহত হতে পারে। প্রদর্শনকালে হঠাৎ কোনো অসুবিধা হলে এর কারণ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে।
- প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় জিনিস আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনে সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।
- প্রদর্শনের গতি দ্রুত হলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাই একথা বিবেচনায় রেখে প্রদর্শনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- কি প্রদর্শন করা হবে এবং কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রদর্শন চলবে।
- প্রয়োজনে প্রদর্শন শুরু করার পূর্বেই শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য আগেই দু-একজনকে প্রস্তুত করতে তাদের সাহায্যে প্রদর্শনের কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।
- কোনো পরীক্ষণ প্রদর্শনের সময় দূর্বোধ্য জায়গাগুলিতে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে চার্ট, মডেল ইত্যাদি উপকরণও ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ, মডেল এমন স্থান থেকে প্রদর্শন করতে হবে বা এমন স্থানে চার্ট টানাতে হবে যেন সকলে দেখতে পায়।
- প্রদর্শনের জন্য প্রাথমিক স্তরে নিজের হাতে তৈরি উপকরণ ব্যবহার করলে পাঠ উপস্থাপন বেশ আকর্ষণীয় হয়।
- প্রদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ যেমন– ছবি আঁকা, গ্রাফ আঁকা বা কোনো প্রতিবেদন তৈরির ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি

সকল স্তরের সকল বিষয়েই পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। পাঠ্যপুস্তক একটি প্রধান উপকরণ হিসেবেই নয় বরং একটি পদ্ধতি হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে। তবে পদ্ধতি হিসেবে পাঠ্যপুস্তককে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পাঠের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনার উপর।

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কখনও কখনও পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষার্থীদের সরবে বা নিরবে পড়ার নির্দেশ দেন। কখনও শিক্ষক নিজে পড়েন, শিক্ষার্থীরা শোনে। এ থেকে বোঝা যায় শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের নানা উদ্দেশ্য এবং সুবিধা রয়েছে। তাহলে বলা যায় শিক্ষক যখন পাঠ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করেন বা শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করার নির্দেশ দেন তখন তাকে পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি বলা হয়। পাঠ্যপুস্তকের সকল তথ্য শিক্ষার্থীদের অবগত করানোই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বিভিন্নভাবে হতে পারে। বিষয়বস্তুর যথাযথ উপলব্ধি এবং আয়ত্ব করার জন্য পাঠ দুই প্রকারের হতে পারে। (১) সরব পাঠ ও (২) নিরব পাঠ। জোরে জোরে উচ্চারণ করে যে পাঠ করা হয় তা সরব পাঠ এবং মনে মনে যে পাঠ তা নিরব পাঠ। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উভয় প্রকার পাঠের প্রয়োজন আছে এবং উভয় ক্ষেত্রে কতগুলো সুবিধা ও অসুবিধা আছে। সরব ও নিরব পাঠের জন্য পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি অত্যাবশ্যক।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা

- সরব পাঠে শিক্ষার্থীকে চোখে দেখে, কানে শুনে ও মুখে উচ্চারণ করে পাঠ্যপুস্তক পড়তে হয়। এতগুলো প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করে বলে বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি সহজতর হয়।
- অনেক সময় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার প্রয়োজন হয়। সরব পাঠে দ্রুত বিষয়বস্তু মুখস্থ করা যায়। সরব পাঠে অনেকগুলো প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ঘটায় বিষয়বস্তু সহজে উপলব্ধি করা যায় এবং উপলব্ধি যত গভীর হয় মুখস্থ তত সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীকে সরবে পাঠ্যপুস্তক পড়ার সুযোগ দিলে শিক্ষার্থী স্পষ্ট উচ্চারণে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে পড়তে পারছে কি না, অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের ব্যবহার, যতি, বিরাম চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা শিক্ষক জানতে পারেন এবং প্রয়োজনে ভুল শুধরে দিতে পারেন।
- সরব পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর জড়তা দূর হয়। লজ্জাশীল ও ভীরু প্রকৃতির শিক্ষার্থীরা সরব পাঠের মধ্য দিয়ে লজ্জা ও ভীরুতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে।
- পাঠের নির্দিষ্ট অংশ নিরবে মনোযোগের সাথে পড়তে দিলে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুগত ধারণা উপলব্ধি করতে পারে এবং বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করতে পারে।

- নিরব পাঠ গভীরভাবে চিন্তা করতে ও চিন্তাকে সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করে। এ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট অংশ বিশ্লেষণ করে এর ভাবার্থ কিংবা সারাংশ উপলব্ধি করে লিখতে পারে এবং পাঠের সমালোচনা করতে পারে।
- কোনো কাজ বা পরীক্ষণের কার্যধারা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণণা করা থাকলে তা অনুসরণ করে দক্ষতার সাথে কাজটি করতে পারে।
- এ পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত ছবি, চার্ট, গ্রাফ, নকশা, মানচিত্র ইত্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝতে ও তাদের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চিত্রধর্মী বর্ণনা করতে পারে।
- পাঠপুস্তকের অনুশীলনীর ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের স্পৃহাকে জাগ্রত করতে পারে।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই বিষয়বস্তু পড়তে ও জানতে পারে।
- এ পদ্ধতির ব্যবহারে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের অসুবিধা

- অনেক সময় শিক্ষার্থীরা না বুঝে বিষয়বস্তু মুখস্থ করে। এতে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনীশক্তি ও অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিতে নিরব পাঠ ছোট্ট সদাচঞ্চল শিশুদের উপযোগী নয়।
- সরব পাঠে সহজেই ক্লান্তি আসে।
- কখনও কখনও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ধারণার বিশদ ব্যাখ্যা থাকে না। আবার অনেক সময় পাঠ্যপুস্তকে ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষক যদি এসব সমস্যা ও বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা না করেন কিংবা ভুল তথ্য সংশোধন না করে দেন তাহলে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।
- শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার শিক্ষার্থীকে অনেক সময় কম পরিশ্রমে ও সহজলভ্যভাবে কোনো বিষয় জেনে সন্তুষ্ট থাকতে দেখা যায়। এতে অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক ও পত্রপত্রিকা পড়ার আগ্রহ থাকে না।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করার উপায়

যদিও পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের ত্রুটি রয়েছে তথাপি এ ত্রুটিগুলো সংশোধন করে একটি মূল্যবান শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষক এটি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন–

- পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা যেন বুঝে মুখস্থ করে এবং দক্ষতার সাথে বিষয়বস্তু উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, সমালোচনা, ভাবার্থ বা সারসংক্ষেপ করতে পারে তার প্রতি শিক্ষকের গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- সকল শিক্ষার্থী যেন সরব পাঠের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পাঠের কোনো অংশ পড়ে তার ভাবার্থ বা সারাংশ লেখার নির্দেশ দেবার পর বৈচিত্র্য আনার জন্য তা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং কাজের কোনো অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি থাকলে শিক্ষার্থী নিজের ভুল শুধরে নিতে পারে। এসব কাজের জন্য শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।
- পাঠপুস্তকে কোনো ভুল তথ্য সরবরাহ করা হলে শিক্ষক তা নিশ্চিত হয়ে সংশোধন করে দেবেন এবং বিতর্কিত কোনো প্রসঙ্গ থাকলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন যেন বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়।
- পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহারের সাথে অন্যান্য পুস্তক, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষক এ পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন বিষয়গুলোর জন্য পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়?
   ক. বাংলা, ইংরেজি
   খ. বিজ্ঞান, সমাজ
   গ. বাংলা, গণিত
   ঘ. সকল বিষয়

২. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি কী?
   ক. সরবে পাঠ্যপুস্তক পড়া
   খ. নিরবে পাঠ্যপুস্তক পড়া
   গ. শিক্ষকের নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা
   ঘ. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শিক্ষণ শিখনে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার

৩. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিতে প্রাথমিক স্তরের কোন শিক্ষার্থীর জন্য সরব পাঠ অধিক উপযোগী?
   ক. ১ম শ্রেণী
   খ. ১ম ও ২য় শ্রেণী
   গ. ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী
   ঘ. সকল শ্রেণীর জন্য

৪. সরব পাঠের অসুবিধা কোনটি?
   ক. বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় না
   খ. একাগ্রতা আসে না
   গ. সরব পাঠে সহজেই ক্লান্তি আসে
   ঘ. ভাবার্থ বা সারসংক্ষেপ করা যায় না

৫. নিরব পাঠের সুবিধা কী?
   ক. নিরব পাঠে পরিশ্রম হয় না
   খ. এটি শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে
   গ. প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর জন্য উপযোগী
   ঘ. নিরব পাঠে সরব পাঠের চেয়ে তাড়াতাড়ি পাঠ মুখস্থ হয়

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রদর্শন পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
২. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. প্রদর্শন পদ্ধতির ৩টি সুবিধা ও ৩টি অসুবিধা লিখুন।
৪. প্রদর্শন পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায়গুলো কী?
৫. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
৬. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতির ৫টি সুবিধা ও ৫টি অসুবিধা লিখুন।
৭. পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিকে কার্যকরী করার উপায়গুলো কী?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। খ।

পাঠ - ৫

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রজেক্ট পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি কি তা বলতে পারবেন।
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরীক্ষণ পদ্ধতি কি তা বলতে পারবেন।
- পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন।
- প্রজেক্ট পদ্ধতি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রজেক্ট পদ্ধতির স্তরগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

আমরা প্রায়ই অনেক কিছু দেখি। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করি না। পর্যবেক্ষণ হলো কোনো বস্তু, ঘটনা কিংবা প্রক্রিয়া দেখে সে সম্পর্কে চিন্তা করা এবং দেখা ও চিন্তার সমন্বয় ঘটানো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা পরিবেশে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করে। শিশুদের পঠন পাঠনের কাজে এ পর্যবেক্ষণকে ব্যবহার করলে যে কোনো বস্তু, ঘটনা কিংবা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের সাধারণ ধারণা গড়ে উঠে। এর উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করলে চিন্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নানা বিষয়ে নানা তথ্য আহরণ করে। পর্যবেক্ষণ দুইভাবে হতে পারে।

প্রকার

- স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার্থী নিজেরা কোনো কিছু দেখে সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে পারে।
- শিক্ষকের পরিচালনায় পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োগ

শিক্ষকের পরিচালনায় যখন পর্যবেক্ষণের কাজ চলে তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বেই জানিয়ে দেন কি পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কি কি তথ্য আহরণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণের কাজটি দলগত ও ব্যক্তিগত দু'ভাবেই হতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তথ্য আহরণ করে খাতায় লেখার জন্য বলেন। যেমন– বিদ্যালয় আঙিনা থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা রকম পাতা সংগ্রহ করার জন্য বলতে পারেন। বিভিন্ন রকমের পাতার আকৃতি ও রং পর্যবেক্ষণ করে তারা খাতায় লিখবে। তারপর শ্রেণীকক্ষে এসে সকলে মিলে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসবে যে,

- পাতার আকৃতি নানা রকমের। যেমন– লম্বাকৃতি, ডিম্বাকৃতি, গোলাকৃতির ইত্যাদি।
- পাতা বিভিন্ন রং এর। তবে অধিকাংশ গাছের পাতা সবুজ।

প্রাথমিক পর্যায়ের বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলোতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পশুপাখি, গাছপালা, নানা রকমের

মাটি, কোন মাটিতে কি ফসল হয়, স্থানীয় যানবাহন, স্থানীয় লোকদের জীবিকা, অঙ্কুরোদগম ইত্যাদি সিদ্ধান্ত আসতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণের মাধ্যমে বা কৃত্রিমভাবে পরীক্ষা করেও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষিত বিষয়ের নমুনা সংগ্রহ করে চার্ট, ছক ইত্যাদি তৈরি করতে পারে। যেমন– আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে আবহাওয়া চার্ট তৈরি করতে পারে, কোনো পরীক্ষা সম্পাদন করে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের ছক তৈরি করতে পারে, ছবি আঁকতে পারে। এভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে পারলে শিক্ষার্থীরা কর্মতৎপরতার মধ্যে থেকে শিখতে পারে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে যে কোনো বস্তু, ঘটনা ও প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করায় শিক্ষার্থীর চিন্তনের ক্ষেত্রে সক্রিয়তা আসে।
- পর্যবেক্ষণ মননমূলক চিন্তনের সমন্বয় ঘটায়, শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং আবিষ্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এতে শিখন স্থায়ী হয়।
- বস্তু, কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করে কোনো কিছুর কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক বুঝে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো কিছুর ছবি অঙ্কন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ছবি আঁকার দক্ষতা গড়ে উঠে।
- পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন জিনিস বা ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতার বিকাশ সাধন হয়।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করলে সময় বেশি লাগে, ফলে অন্যান্য ক্লাশের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।
- পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

পরীক্ষণ পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই অথবা শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে কোনো ঘটনা বা সমস্যার পিছনে যে সব কারণ রয়েছে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সনাক্ত করে সমস্যার সমাধান বের করতে সচেষ্ট হয় তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলে।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক কোনো তথ্য বা ঘটনাকে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা নানাভাবে এসব ঘটনা ও সমস্যার কারণ প্রমাণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করে। এখানে শিক্ষার্থী নিজে পরীক্ষা করার সুযোগ পায় তবে তাকে নতুন করে কিছু আবিষ্কার করতে হয় না। আবিষ্কৃত তথ্যগুলো পূর্ব জ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা করে যাচাই করা হয় মাত্র।

পরিবেশ পরিচিতি, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্য পরীক্ষণ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। যেমন দিনরাত হওয়ার কারণ কী? বায়ু কী পদার্থ? বায়ুর কি চাপ আছে? বৃষ্টিপাতের কারণ কী? শিক্ষার্থীরা এসব সম্পর্কে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পর শিক্ষার্থীরা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা লিখতে পারে।

আপনি এভাবে যে কোনো তথ্য বা সত্যকে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষণ পদ্ধতিতে তাদের হাতে কলমে কাজের সুযোগ দিয়ে সক্রিয় শিখনে সহায়তা করতে পারেন।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা

- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করে। ফলে পাঠের প্রতি মনোযোগী থাকে।
- শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী মন পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য উন্মুখ থাকে। এতে পাঠের প্রতি স্বত:স্ফূর্ত প্রেষণা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করায় শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হয়।
- এ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা, পর্যবেক্ষণ করা, পরীক্ষা করা, ফলাফল লিখে রাখা ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসা, পরীক্ষণের জন্য উপকরণ সংগ্রহ ও যন্ত্রপাতি সাজানোর সুযোগ থাকায় নানা রকমের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা

- আমাদের মত দেশে বিদ্যালয়গুলোতে অনেক সময় পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বা ক্রয় করা সম্ভব হয় না বলে পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা অসুবিধা হয়ে পড়ে। তখন শিক্ষক বাধ্য হয়ে প্রদর্শন পদ্ধতির আশ্রয় নেন।
- এ পদ্ধতিতে সময় বেশি লাগে, পাঠ্যসূচি সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না।
- এ পদ্ধতিতে যথেষ্ট ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। চঞ্চলমতি শিশুদের দিয়ে পরীক্ষা চালাতে হলে শিক্ষকের খুবই সতর্ক থাকার প্রয়োজন হয়।

প্রজেক্ট পদ্ধতি

আধুনিক বিশ্বে প্রজেক্ট বা প্রকল্প পদ্ধতি শিক্ষাবিদদের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন আমেরিকার শিক্ষাবিদ জন ডিউই এবং প্রবর্তক হলেন তার শিষ্য কিলপ্যাট্রিক।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কোনো বাস্তব কাজ বা বাস্তব সমস্যা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায় তা সমাধান করতে বলা হয়। এ পদ্ধতিতে শেখার বিষয়বস্তুটি আগে থেকেই শিক্ষার্থীকে নির্ধারণ করে দেয়া হয় না। কি এবং কতটুকু তাকে শিখতে হবে শিক্ষার্থী তা স্বাধীনভাবে নিজেই নির্ধারণ করে এবং সমাধানের জন্য কৌতূহলী হয়। ফলে তারা আন্তরিকতার সাথে কাজটি করে।

প্রজেক্টের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ যে বক্তব্য দিয়েছেন তা হলো–

- প্রজেক্ট কোনো উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশে আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। (কিলপ্যাট্রিক)
- স্বাভাবিক পরিবেশে কোনো সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে প্রজেক্ট বলে। (ড. ড. স্টিভেনসন)

- প্রজেক্ট সেই শিক্ষামূলক পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীকে বেশি পরিমাণে উদ্দেশ্যমূলক কাজে উৎসাহিত করে। (জি. এস. কৃষ্ণমায়া)

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে যে কোনো সমস্যাই শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পাদন করে। যদি কোনো একক সমস্যা সমাধান করতে হয় তাহলে তার জন্য সে সমাজে অন্যের সাহায্যে বা পরামর্শ নিয়েও কাজটি করতে পারে।

প্রজেক্টের কাজের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে–

- কাজের ইউনিট ঠিক করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা
- পরিকল্পনা করা
- কার্য সম্পাদন করা
- মূল্যায়ন করা।

প্রজেক্ট দুই ধরনের হতে পারে

- বুদ্ধিমূলক ও
- কার্যমূলক

বুদ্ধিমূলক কার্য সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে বাস্তবে কাজটি করতে হয় না। তবে বই পড়ে, আলোচনা করে কাজটি সমাধান করতে পারলেই হলো। কার্যমূলক সমস্যা শিক্ষার্থীকে বাস্তবে করতে হয়।

শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের প্রকল্পের কাজ ঠিক করবেন। যেমন– বাগান করা, মিনি পুকুর তৈরি করা, শিক্ষণীয় কোনো মডেল তৈরি করা, কোনো কিছুর নকশা তৈরি করা ইত্যাদি।

কাজের ইউনিট ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ

শিক্ষার্থীরা প্রকল্পের কাজের প্রথম পর্যায়ে তাদের করণীয় কাজটি নির্বাচন করবে। এ স্তরে যে প্রজেক্টটি নির্বাচন করবে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি ধারণা গঠন করবে। অর্থাৎ কি কাজ করবে এবং কেন করবে এটাই প্রথম নির্ধারণ করবে। শিশুদের অভিজ্ঞতা কম বলে শিক্ষক সাহায্য করবেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশুরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পাদনের পরিকল্পনা করবে। শিশুদের পরিকল্পনায় ভুল থাকলে বা সময়ের অপচয় রোধ করতে শিক্ষক তার অভিজ্ঞ পরামর্শ দিতে পারেন। প্রজেক্ট বড় হলে কাজের গুরুত্ব ও পরিশ্রম অনুসারে এবং শিশুদের যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের কাজ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

কার্য সম্পাদন

কাজের পরিকল্পনা অনুসারে দলে ভাগ হয়ে শিশুরা কাজ করবে। কাজ চলাকালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে কিংবা ভুল হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীদের কাজ পরিদর্শন করা, পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়া, প্রয়োজনে সহযোগিতা করা। তবে শিক্ষক কোনো অবস্থাতেই শিশুদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন না। কাজ শেষে শিশুরা তাদের কাজের বিবরণ লিখে রাখবে।

আলোচনা ও মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য অনুসারে কাজটি কতটুকু করা গেল, কি করা গেল না, কেন গেল না, প্রতিকারের উপায় কি ইত্যাদি মূল্যায়নের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিশুদের অভিজ্ঞতা কম বলে শিক্ষককে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। পরিকল্পনা অনুসারে কোনো কাজ না করতে পারলে অথবা ভুল করলে শিক্ষক সহানুভূতির সঙ্গে সেগুলো ধরিয়ে দেবেন এবং সংশোধনের উপায় বলে দেবেন।

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা

- প্রজেক্ট নির্বাচন, পরিকল্পনা ও রূপদান এবং মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের আলোচনার জন্য শিক্ষক গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দেবেন।
- কাজটি করার সময় তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কোনোভাবেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে কাজটি করার জন্য উৎসাহ দেবেন।
- প্রজেক্টের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

প্রজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা

- নানা কাজের মধ্য দিয়ে, হাতেকলমে শিক্ষা হয় বলে শিশুদের শিখন ভাল হয়।
- শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করতে শেখে।
- শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন হয়।
- বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচিত হয়।
- ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের সুযোগ থাকায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আত্মনির্ভরশীলতা, শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দলানুগত্যের মনোভাব গড়ে উঠে।
- কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থী আত্মসমালোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনা করার সুযোগ পায়।

প্রজেক্ট পদ্ধতির অসুবিধা

- অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকলে এ পদ্ধতি পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিক শিক্ষার্থীকে প্রজেক্টের কাজে নেতৃত্ব দেওয়া অসুবিধা হয়।
- সুপরিকল্পিত না হলে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যর্থ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?
   - ক. দেখে অথবা পর্যবেক্ষণ করে বস্তু সম্পর্কে বাস্তব ধারণা হয়
   - খ. কোনো বস্তু দেখলেই তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা হয় কিন্তু পর্যবেক্ষণে তা হয় না
   - গ. দেখা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে মূলত: কোনো পার্থক্য নেই
   - ঘ. পর্যবেক্ষণ করলে দেখা বস্তুটি সম্পর্কে মননমূলক চিন্তার সমন্বয় ঘটে তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়

২. পরীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অধিক মনোযোগী থাকে কারণ–
   - ক. শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা নেন
   - খ. শিক্ষার্থীরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়
   - গ. শিক্ষক কাজের আগ্রহ বাড়িয়ে দেন
   - ঘ. বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে

৩. প্রকল্প পদ্ধতি কে প্রবর্তন করেন?
   - ক. স্টিভেনসন
   - খ. কিলপ্যাট্রিক
   - গ. ডিউই
   - ঘ. কৃষ্ণমায়া

৪. বিদ্যালয় বা সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রেখে সমস্যা সমাধানের বিশেষ শিক্ষাদান পদ্ধতির নাম কী?
   - ক. প্রদর্শন
   - খ. পরীক্ষণ
   - গ. প্রজেক্ট
   - ঘ. পর্যবেক্ষণ

৫. প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা কী?
   - ক. কাজটি সম্পূর্ণভাবে নিজে করা
   - খ. শুধু শিক্ষার্থীদের কাজ দেখা
   - গ. শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করা
   - ঘ. যোগ্যতা অনুসারে কাজ বন্টন ও প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

২. পরীক্ষণ পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?

৩. পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।

৪. প্রজেক্ট পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় দিকগুলো কী?

সঠিক উত্তর

অ) ১।ঘ, ২।খ, ৩।খ, ৪।গ, ৫।ঘ।

পাঠ - ৬

ভূমিকাভিনয় ও শিক্ষাভ্রমণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন ।
- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা বলতে পারবেন ।
- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন ।
- শিক্ষাভ্রমণ কী তা বলতে পারবেন ।
- শিক্ষা ভ্রমণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষা ভ্রমণের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন ।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পনা ও সংগঠন কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন ।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি

শিশুরা ছোটবেলায় বয়স্কদের অনুকরণ করে । বাবা মাকে অনুকরণ করে সেভাবে কথা বলে । আরও বড় হলে অঙ্গভঙ্গি করে অপরকে অনুকরণ করতে ও কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করতে ভালবাসে । আবার অপরের অঙ্গভঙ্গি দেখাতেও ভালবাসে । শিশুদের এ প্রবণতাকে শিখনের কাজে লাগালে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম প্রাণবন্ত হয়ে উঠে ।

প্রয়োগ

অভিনয় শিশু দর্শকের অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় । এর মাধ্যমে শিখন স্বতঃস্ফূর্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হয় । প্রাথমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, সমাজ ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো পাঠের জন্য ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি বেশ কার্যকরী । অভিনয়ের মাধ্যমে যে শুধুমাত্র শিখনই হয় তা নয় অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য শিশুদের নানারকম কাজ করার সুযোগ আসে । যেমন ২য় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের বাঘ ও বকের গল্পটি অভিনয় করতে বলা হলে তাদেরকে বাঘ, বক ও শিয়ালের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নানা রকমের কাজ করার প্রয়োজন হয় । শিক্ষকের সহায়তায় তারা বাঘ, বক ও শিয়ালের ছবি আঁকা মুকুট তৈরি করে, দৃশ্যপট তৈরি করে, কথোপকথনের জন্য স্ক্রীপ্ট তৈরি করে, মনোযোগের সাথে ভূমিকাভিনয়ের জন্য নিজ নিজ অংশ ভাল করে বুঝে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করে ইত্যাদি । তেমনি অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ বিশেষ পাঠ শিশুরা ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে ।

প্রস্তুতি

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করতে হলে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন । যারা ভাল অভিনয় করে তাদেরকে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে অন্যদেরকে দর্শকের ভূমিকায় রাখতে হবে । পালাক্রমে অন্যদেরকেও অভিনয়ের সুযোগ দিতে হবে । চরিত্র অনুযায়ী ভূমিকাভিনয়ের জন্য সংলাপ মুখস্থ করা ও মহড়া দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে হবে । তবে সাধারণ পাঠের সময় এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে মঞ্চ তৈরি, দৃশ্যপট তৈরি ও আনুষঙ্গিক কাজ করার প্রয়োজন হয় না ।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা

- অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষন শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়।
- বাস্তবতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে পারায় শিক্ষার্থীদের শিখন স্বচ্ছ, বাস্তবধর্মী ও সহজ হয়।
- বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানের কোনো কোনো বিষয়বস্তু অত্যন্ত সার্থকভাবে শেখানো যায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা

- এ পদ্ধতিতে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়। এতে কিছু ব্যয় হয়।

শিক্ষাভ্রমণ

জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষাভ্রমণের বিশেষ অবদান রয়েছে। শিক্ষাভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরিবেশের শিক্ষণীয় বিষয়ের সাথে পরিচিত হয় এবং বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পুস্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং সেগুলো মুখস্থ করে। কিন্তু ঐ সব বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান তাদের থাকে না। যেমন- নদী, পাহাড়, পর্বত, বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, লালবাগের কেল্লা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, আবহাওয়া অফিস। এগুলো সম্বন্ধে জানলেও বাস্তবে এগুলো দেখলে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট হয়। শিক্ষাভ্রমণ এমন একটি পদ্ধতি যা শ্রেণীকক্ষে বাস্তবে এনে দেখানো সম্ভব নয়। কেবল বাইরের প্রকৃতিতেই দেখা যায়। এমন প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়াকে শিক্ষাভ্রমণ বলে।

ভ্রমণের স্থান দুই প্রকার হতে পারে। (ক) নিকটবর্তী স্থানে ভ্রমণ ও (খ) দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ।

ভ্রমণের স্থান দূরে হলেই যে শিক্ষামূলক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় তা নয়। প্রকৃতপক্ষে একই উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী স্থানে ভ্রমণ বেশি উপযোগী। কারণ এতে সময় বাঁচে এবং খরচও কম হয়। তবে প্রাথমিক স্তরের সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জন্য স্কুল পরিবেশ ও নিকটবর্তী স্থান ছাড়াও দূরে যাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষাভ্রমণের পরিকল্পনা

শিক্ষাভ্রমণকে কার্যকরী করতে হলে আগে থেকে পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনা করার সময় যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন তা হলো–

- ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিরূপণ করুন।
- ভ্রমণের এলাকা নির্বাচন করুন।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিন।
- শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সম্মতি নিন।

- ভ্রমণ এলাকার কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবহিত করুন ।
- যানবাহন সম্পর্কিত ব্যবস্থা, আশ্রয়, খাবার, পানি, পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহার সম্পর্কে খোঁজ নিন ।
- নিয়ম শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিন ।
- শিক্ষার্থীদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিন। শিক্ষামূলক স্থানে গিয়ে কি দেখতে হবে, কি তথ্য জানতে হবে, কি প্রশ্ন হবে ইত্যাদি শিখিয়ে দিন ।
- ভ্রমণ শেষে কিভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন তা ঠিক করুন। যেমন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অভীক্ষা তৈরির মাধ্যমে অথবা কোনো প্রতিবেদন লেখা বা মডেল তৈরির কাজ দিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হলো কি না তা মূল্যায়ন করুন ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের গুরুত্ব

- শিক্ষামূলক ভ্রমণকে শ্রেণীশিক্ষার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায় ।
- এর মাধ্যমে বাইরের জগতের সাথে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ।
- শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে ।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক গুণ, যেমন- সহযোগিতার মনোভাব, আত্মনির্ভরশীলতা ও দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে ।
- শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে বাস্তব ও প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা যায় ।

সতর্কতা

এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও শিক্ষামূলক ভ্রমণ অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে যদি শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও পূর্ব পরিকল্পনা না থাকে। তাই পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগে বেশি সময় দিন। যেখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া হবে সেখানকার কর্তৃপক্ষকে পূর্বেই অবহিত করুন যে সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের কি বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন হবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন বিষয়ের জন্য ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়?
   - ক. বাংলা
   - খ. বিজ্ঞান
   - গ. সমাজ
   - ঘ. উপরের সকল বিষয়ে

২. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে শিখন স্বতঃস্ফূর্ত হয় কারণ–
   - ক. বাস্তবতার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করতে পারায় তা শিক্ষার্থী দর্শকের অনুভূতিকে নাড়া দেয়
   - খ. এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অভিনয় ছাড়া অন্য কাজ করতে হয় না
   - গ. সকল শিক্ষার্থী একত্রে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে
   - ঘ. শিশুরা অনুকরণ করতে পছন্দ করে

৩. শিক্ষামূলক ভ্রমণকে কার্যকরী করতে হলে কোন কাজটি প্রথমে করা উচিত?
   - ক. ভ্রমণের পরিকল্পনা
   - খ. ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিরূপণ
   - গ. নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দান
   - ঘ. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ

৪. শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য কোন অবস্থায় বেশি সময় দেওয়া উচিত?
   - ক. শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিরূপণে
   - খ. পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগে
   - গ. শিক্ষামূলক ভ্রমণের পর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট প্রণয়নে
   - ঘ. জ্ঞান আহরণে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
২. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষামূলক ভ্রমণ কী?
৪. শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠনের নিয়ম উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।ঘ, ২।ক, ৩।খ, ৪।খ।

পাঠ - ৭

কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন ।
- কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ফ্রয়েবেলের ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন ।
- খেলার মাধ্যমে শিশুদের কী কী গুণের বিকাশ সাধন হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- এ পদ্ধতিতে কোন কোন কাজের মাধ্যমে শিখনের ব্যবস্থা করা যায় তা বলতে পারবেন ।
- কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন ।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি

জার্মানীর শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তক । তিনি ১৮৩৭ সনে ৩ থেকে ৮ বছর বয়সের শিশুদের জন্য তাঁর শিক্ষা দর্শনকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এক নতুন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এ বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হয় কিণ্ডারগার্টেন ।

বৈশিষ্ট্য

'কিণ্ডারগার্টেন' শব্দটি জার্মান শব্দ । এ শব্দের অর্থ শিশুদের বাগান অর্থাৎ যেখানে শিশুরা চারা গাছের মত সযত্নে প্রতিপালিত হয় । ফ্রয়েবেল তাঁর বিদ্যালয়কে বাগান আর শিক্ষককে বাগানের মালীর সাথে তুলনা করেছেন । অর্থাৎ বাগানে মালী যেমন সযত্নে চারাগাছের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন, তেমনি শিক্ষকও বাগানের মালীর মতো, যিনি শিশুদেরকে চারাগাছের মত সযত্নে শিক্ষার মাধ্যমে তার জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সহায়তা করবেন । কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বর্তমানের শিক্ষা জগতে শিশুদের শিক্ষার এটি একটি অন্যতম শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল কথা, শিক্ষক শিশুদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য, প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করবেন যা প্রকাশ পায় শিশুর খেলায় । ফ্রয়েবেলের মতে শিশুকালে খেলাই হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজ । শিশুর খেলার মাঝেই সৃজনাত্মক কাজ ও স্বাধীন মনোভাব লক্ষ্য করা যায় । সুতরাং কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষার ধারা চলবে খেলাকে কেন্দ্র করে ।

কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে খেলার মাধ্যমে শিশুদের কতগুলো নৈতিক গুণের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা । যেমন-আত্মসংযম, সততা, বিশ্বস্ততা, স্বাধীনতা, অপরের কাজ সম্পর্কে বিবেচনাবোধ, অধ্যবসায় ও সহযোগিতা ইত্যাদি ।

ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো খেলা, মনের মত কাজ ও গানের মধ্য দিয়ে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা– যার মধ্য দিয়ে শিশুদের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকবে । তাঁর মতে আত্মপ্রকাশের তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে সঙ্গীত,

দেহের পরিচালনা অর্থাৎ খেলা ও নৃত্য এবং গঠনমুলক কাজ। যদিও এ তিনটি প্রক্রিয়া ভিন্নতর তবুও এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। যেমন– শিশুর কাছে একটি গল্প বলার সময় গল্পটি যদি সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিনীত হয় এবং এর সাথে সাথে নানা রকমের রঙ্গীন কাগজ, মাটি ও নানা রকমের দ্রব্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে শিশুদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাধারাকে বাস্তব জিনিসের সহযোগিতায় উন্নতি সাধন করা যায়। ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে দলগতভাবে বিভিন্ন রকমের হাতের কাজ, নাচ, ছড়া, গান, খেলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি জুড়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়েই হাত, চোখ, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা বৃদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর পরিমার্জনা করা হয়।

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা

বাস্তব বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা

শিশুদের শিক্ষার জন্য ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু বিশেষ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হতো। তিনি এগুলোর নাম দেন Gifts বা উপহার সামগ্রী। উপহার সামগ্রীগুলোর মধ্যে যেমন খেলার বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির নানা ইঙ্গিত এবং শিশুদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সক্রিয়তা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। গিফট হিসেবে ফ্রয়েবেল রঙিন উল, কিছু গোলাকৃতি, বেলনাকৃতি, ত্রিকোনাকৃতি ও ঘনাকৃতির কাঠের বস্তু ব্যবহার করতেন। গিফটস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি বস্তুকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো ও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা। বিভিন্ন রং সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার জন্য তিনি লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও বেগুণী রং এর উলের বল ব্যবহার করতেন। উলের বল দিয়ে শুধুমাত্র খেলা বা গোলাকার বস্তু কিংবা রং এর ধারণা দেয়া ছাড়াও শিশুর মনে সর্বব্যাপী একতার ধারণা সৃষ্টি করার জন্যও তিনি এগুলোর ব্যবহার করতেন। কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের বৃত্তাকারে দাঁড়ানোর প্রথাটিও একতার ধারণা সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রবর্তন করেন।

নানা আকৃতি সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা লাভের জন্য তিনি কাঠের তৈরি বিভিন্ন আকৃতির বস্তুর ব্যবহার করতেন। একটি বড় কাঠের কিউব (ঘনাকৃতি) যা আটটি কিউবে বিভক্ত তা শিশুদেরকে পূর্ণ ও অংশের জ্ঞান লাভ করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এগুলো দিয়ে শিশুরা বেঞ্চ, সিঁড়ি, দরজা, রেলগাড়ি, পুল ইত্যাদি তৈরি করতে পারত। কিছু সামগ্রী গণনার কাজেও ব্যবহার করা হতো। এসব দ্রব্যাদির সাহায্যে শিশুদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখা যায় এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তারা কাজ সমাধান করে। এসব কাজের সাথে মিল রেখে ফ্রয়েবেল কতগুলো কর্মসূচক খেলার অবতারণা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কাগজ ভাঁজ করা, শক্ত কাগজ দিয়ে প্রতীক তৈরি করা, কাদামাটি দিয়ে প্রতীক তৈরি করা উল্লেখযোগ্য। শিশুদের এ কাজগুলোকে বলা হয় Occupation বা বৃত্তি। গিফটস থেকে Occupation গুলো বেশি সৃজনাত্মক।

হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুরা কাদামাটি, কাগজ, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ব্যবহার করে নানা জিনিস তৈরি করে। এ ছাড়াও শিশুরা মাদুর ও ঝুড়ি তৈরি করে এবং সেলাই করে। এসব কাজে তারা খুব আনন্দ পায়।

ছবি অঙ্কন

শিশুদেরকে চক, পেন্সিল ইত্যাদির সাহায্যে বোর্ডে বা কাগজে ইচ্ছামত ছবি আঁকতে বলা হয়। নিজ ইচ্ছামত নানা রকমের রেখা ও ছবি আঁকলে শিশুদের হাতের জড়তা কেটে যায়। এরপর কোনো ছবি বা জিনিস দেখে আঁকতে দেয়া হয়। শিশুরা পাতা, গাছ, পশু, পাখি আঁকে। পরবর্তীতে এসব ছবিতে রঙ দিতে শেখে।

ছবির সাহায্যে শিক্ষা

শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখিয়ে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানিয়ে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা হয়।

গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

গল্পের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বেশি থাকে। তাই এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে শিশুদের নিকট তা আনন্দময় ও গ্রহণযোগ্য হয়।

প্রকৃতি পাঠ ও বস্তুপাঠ

প্রকৃতি পাঠ ও বস্তু পাঠের প্রথম প্রচলন করেন ফ্রয়েবেল। প্রতিটি কিণ্ডারগার্টেনে একটি বাগান থাকে। শিশুরা বাগানে ছোট ছোট গাছ লাগায় এবং চারাগাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে গাছ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ ছাড়াও শিশুরা কিণ্ডারগার্টেনে নানা পশুপাখি পালন করে। এগুলোর জীবনযাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে।

খেলা ও গান

খেলা ও গান এ দুটি বিষয় শিশুদের বেশি পছন্দ। তাই খেলা ও গান কিণ্ডারগার্টেনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুরা কল্পনা করতে পছন্দ করে তেমনি অন্যকে অনুকরণ করতেও ভালবাসে। সেজন্য কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদেরকে গাছ, পশুপাখি ইত্যাদি সাজিয়ে অভিনয়মূলক খেলা খেলতে দেওয়া হয়, গানের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুরা নাচ করতেও শেখে। তাছাড়া গানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালন ও ব্যায়াম করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

পঠন ও লিখন শিক্ষা

শিক্ষক ছবির মাধ্যমে অর্থবোধক শব্দ ও বাক্য তৈরি করে বার বার পাঠ করেন। শিশুরা এসব দেখে ও শুনে পুনরাবৃত্তি করে পড়তে শেখে। এসব অর্থবোধক বাক্য ও শব্দ থেকে অক্ষর চিনে শিশুরা নিজেরা শব্দ ও বাক্য গঠন করে। কাঠি, বীচি ইত্যাদি দিয়ে অক্ষর তৈরি করে। বোর্ডে শিক্ষকের লেখা ও নিজেদের সাজানো অক্ষর দেখে নিজেদের খাতায় বা বোর্ডে লিখতে শেখে।

গণনা শিক্ষা

শিশুরা গিফ্‌টসগুলো ব্যবহার করে গণনা করতে শেখে। কাঠি, বীচি ইত্যাদির সাহায্যে গণনা করে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করতে পারে।

নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা

কিণ্ডারগার্টেনে শিক্ষক কাজের শুরুতে সৃষ্টিকর্তার গুণের কথা বলেন। তাঁর দয়া দান, ভালবাসা, কিসে তিনি সন্তুষ্ট, কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন সেসব কথা বলেন। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে গল্পের ছলে তাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধনও করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ : আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষণ শিখনে কে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন?
   ক. রুশো
   খ. ফ্রয়েবেল
   গ. পেষ্টালৎসী
   ঘ. মন্টেসরী

২. শিক্ষণ শিখনে গিফট বা উপহার সামগ্রীকে ফ্রয়েবেল কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন?
   ক. শ্রেণী শিক্ষাকে তুলে দেয়ার জন্য
   খ. শিশুর কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য
   গ. হাতের কাজ শিখিয়ে পেশাগত উন্নতির জন্য
   ঘ. শিশুকে সক্রিয়তার মধ্যে রেখে শিক্ষা দেয়ার জন্য

৩. কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে পূর্ণ ও অংশের জ্ঞান লাভ করার জন্য কী ব্যবহার করা হতো?
   ক. রঙিন উলের বল
   খ. কাঠের তৈরি বড় ও ছোট কিউব
   গ. কাদামাটি
   ঘ. জ্যামিতিক আকৃতির বিভিন্ন বস্তু

৪. কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে কোনটি অনুপস্থিত?
   ক. দলগত কাজ
   খ. ব্যক্তিগত কাজ
   গ. শারীরিক কাজ
   ঘ. হাতের কাজ

৫. আধুনিক কালে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি সর্বজন স্বীকৃত হওয়ার কারণ কী?
   ক. অল্পবয়সী শিশুদের আটকে রাখার উত্তম উপায়
   খ. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য খুবই উপযোগী
   গ. শিশুকে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শিখানোর উত্তম পদ্ধতি
   ঘ. শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য মনোবিজ্ঞান সম্মত

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
২. এ পদ্ধতিতে কোন কোন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। খ, ৫। ঘ।

পাঠ - ৮

মন্টেসরী পদ্ধতি
মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন।
- মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণের নামগুলো বলতে পারবেন।
- মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তক ইতালীর বিখ্যাত শিশু শিক্ষাবিদ ড. মারিয়া মন্টেসরী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইতালীর মানসিক হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা বৃত্তি ছেড়ে পরবর্তীতে সারা জীবন শিক্ষামূলক গবেষণায় নিয়োজিত হন। চিকিৎসক থাকাকালীন তিনি ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে এক পরীক্ষা চালান। সেখানে তিনি যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন তাতে বেশ ভাল ফল পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মনে করলেন এসব উপকরণ ব্যবহার করে মানসিকভাবে ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিশুরা যদি ভাল ফল পেতে পারে, তাহলে স্বাভাবিক মেধাসম্পন্ন শিশুরা আরও বেশি উপকৃত হতে পারে। শিক্ষার উপর তাঁর এ পরীক্ষা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। ১৯০৭ সনে তিনি স্বাভাবিক শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি এ বিদ্যালয়ের নাম দেন শিশু নিকেতন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশুর মাঝে যেসব অন্তর্নিহিত প্রতিভা আছে তা শিশুর প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলাই হলো শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা। পরবর্তীতে মন্টেসরীর শিশুর নিকেতন অনুসৃত পদ্ধতির নাম হয়েছে মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতি।

বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য

মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতি এমনই একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক বিশেষ পদক্ষেপ। তাঁর মতে শ্রেণীশিক্ষা শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। কারণ প্রত্যেকটি শিশুর মানসিক গঠন প্রকৃতি অন্য শিশুর চেয়ে আলাদা। কাজেই একই নীতিতে সকলের শিখন বিজ্ঞানসম্মত নয়।

শিক্ষিকার ভূমিকা

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষিকার ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র একজন সাহায্যকারী হিসেবে। সেজন্য তিনি শিক্ষিকার নামকরণ করেছেন ডাইরেকট্রেস বা পরিচালিকা হিসেবে। শিশুরা প্রয়োজনের তাগিদে মনের আনন্দে কাজ করবে এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষা লাভ করবে। পরিচালিকা তাদের দিকে লক্ষ রাখবেন। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে শিশুকে সাহায্য করবেন। তিনি ফ্রয়েবেলের উপহার ও বৃত্তির (gifts & occupation) মতো বিভিন্ন রকমের উপকরণ ব্যবহার করেন। এগুলোর নাম দিয়েছেন ডিডাকটিভ যন্ত্র (didactive apparatus)| এসব উপকরণ এমন পরিকল্পিত ছিল যে, শিশুরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেবে এবং নিজেরাই নিজেদের ভুল সংশোধন করবে। এই শিক্ষাকে মন্টেসরী স্বয়ংশিক্ষা বা Auto education বলেছেন।

তিনি শিক্ষামূলক যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে ছিল–

- তিন ধরনের ঘনবস্তু
- বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির কাঠের ফলক যেমন– প্রিজম, পিরামিড, গোলক, বেলনআকৃতি ও মোচাকৃতি ইত্যাদি
- বিভিন্ন আকৃতির চতুষ্কোন কাঠের খণ্ড, মসৃণ ও অমসৃন
- নানা রকমের কাপড়ের টুকরা
- বিভিন্ন ভরের কাঠের টুকরা
- রং করা শেখার জন্য নানা ধরনের জ্যামিতিক আকৃতির কার্ড
- দুইটি বাক্সের প্রত্যেকটিতে ৬৪টি রঙ্গীন কাঠের টুকরা
- স্বর উৎপাদনের জন্য কতগুলো বন্ধ কৌটা ও দুই সারি ঘন্টা।

এছাড়াও হাতের লেখা ও গণিত শিক্ষার জন্য ছিল–

- ডেস্ক যার মধ্যে ছিল নানা আকারের লোহার জ্যামিতিক আকৃতি
- কার্ডের উপর আটা শিরিষ কাগজের বড় বড় অক্ষর ও সংখ্যা
- একটি কার্ড বোর্ডের বাক্সে মসৃণ কাগজ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রংয়ের বর্ণমালা ও সংখ্যা
- কতগুলো রেখাচিত্র ও বিভিন্ন রংয়ের পেন্সিল
- কাঠের ফ্রেমে কাপড়, ফিতে ইত্যাদি বিভিন্নভাবে আটকানো
- কাপড়ে বোতাম লাগানো ও শক্ত করে ফিতা বাধা।

এসব শিক্ষামূলক সরঞ্জাম নাড়াচাড়া ও খেলার মাধ্যমে শিশুরা নানা ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। যেমন- তিনটি ঘন কাঠের টুকরার প্রত্যেকটিতে ১০টি করে ছিদ্র আছে। এর সাথে আছে ১০টি লম্বা বেলনাকৃতির কাঠের টুকরা। এগুলোর ব্যাসের পার্থক্য রয়েছে। তবে টুকরাগুলো ও ছিদ্রগুলো উচ্চতায় সমান। লম্বা টুকরাগুলোর একদিকে আংটা লাগানো থাকে যা সহজেই টেনে তোলা যায়।

দ্বিতীয় ঘনাকৃতি কাঠের গর্তগুলোর ও লম্বা কাঠের টুকরাগুলোর ব্যাস সমান কিন্তু এগুলোর উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার

তৃতীয় কাঠের সারির জন্য লম্বা কাঠের টুকরাগুলোর আকৃতি ও আয়তনের পার্থক্য রয়েছে। শিশু লম্বা কাঠের টুকরাগুলো টেনে বের করে আবার সঠিক স্থানে লাগাবে। যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে, বারবার ভুল করে ও চেষ্টা করে সে ঠিক ঠিক গর্তে লম্বা টুকরা বসাতে চেষ্টা করবে। এভাবে খেলার আনন্দে মেতে উঠবে এবং টুকরা বসাতে বসাতে বার বার ভুল ও চেষ্টার মাধ্যমে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে ব্যাস, উচ্চতা-আকৃতি ও আয়তনের ধারণা লাভ করবে। এভাবে খেলতে খেলতে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে ও সংশোধনের পর নিজে নিজেই স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করে।

শিক্ষামূলক কাজের সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে বাস্তব জীবনের কাজ ও শিক্ষা দিয়ে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে দেওয়া হয়। যেমন, শিশুরা বিদ্যালয়ে আসলে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে হাতমুখ ধুতে, গোসল করতে, কাপড় পড়তে শিক্ষা দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে টেবিল ও ঘর পরিষ্কার করা, আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখা, টেবিলে খাবার দেওয়া ও বাসনপত্র পরিষ্কার করার কাজ দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য আসবাবপত্রগুলো ছিল খুবই হালকা ধরনের যেন শিশুরা দরকার হলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিতে পারে। এ ছাড়া

শারীরিক শিক্ষা যেমন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, শরীর পরীক্ষা, খেলা, বাজনার তালে তালে ব্যায়ামের ব্যবস্থাও এ পদ্ধতিতে আছে। মন্টেসরী বিদ্যালয়ে শিশুরা সব কাজ নিজেরাই করে।

মন্টেসরী শিক্ষাব্যবস্থায় চিত্রাঙ্কন, বাগানের কাজ, পশুপাখি পালন এসবের ব্যবস্থাও আছে। এর মধ্য দিয়ে তারা উদ্ভিদ ও পশুপাখি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদের প্রথম থেকেই নীরবতা অভ্যাস করতে হয়। নিঃশব্দে চলাফেরা করা, আস্তে কথা বলা, কাজ করা ইত্যাদির অভ্যাস শিশুরা গড়ে তুলবে। এই নীরবতা তার শিক্ষাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে।

মন্টেসরী পদ্ধতিতে অত্যন্ত যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর মতে, স্বাধীনতাই শৃঙ্খলার ভিত্তি এবং এই শৃঙ্খলা কোনো শক্তি আরোপ করে অর্জন করা যায় না। শিশুকে তার বয়সোপযোগী আনন্দদায়ক কাজে নিযুক্ত রাখতে পারলে শৃঙ্খলা আপনা আপনিই গড়ে উঠে। কর্তব্য পালনে তার উপলব্ধিই তাকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুপ্রেরণা যোগায়।

পড়া লেখা ও গণিত শিক্ষার পদ্ধতি

মন্টেসরী তাঁর পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়গত শিক্ষার পর পড়া, লেখা ও গণিত শিক্ষার স্থান দেন। লেখা শেখার জন্য জ্যামিতিক আকারের কাঠের, ধাতুর বা কার্ডবোর্ডের জিনিস সাদা কাগজের উপর রেখে শিশুকে তার রেখাচিত্র আঁকতে দেওয়া হয়। এরপর রঙিন পেন্সিল কলমের মত ধরে রেখা টেনে সেগুলোর ভিতর রঙ করতে দেওয়া হয়। মোটা কাগজের অক্ষরগুলো কেটে তার উপর শিরিষ কাগজ এঁটে দেওয়া হয়। শিশুরা এসব অক্ষরের উপর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে হাত বুলায়। এরপর শিক্ষকের অনুকরণে উচ্চারণ করে। এভাবে চোখে দেখে, পেশীর ব্যবহার করে, স্পর্শের মাধ্যমে ও শুনে প্রতিটি অক্ষরের প্যাটার্ন সম্পর্কে শিশুকে অনুভূতি জন্মে ও অক্ষরের সাথে ধ্বনির সংযোগ ঘটে। মন্টেসরীর মতে, পড়া হতে লেখা শিক্ষা সহজ তাই তিনি শিশুদের জন্য প্রথমে লেখা শিক্ষার সুপারিশ করেছেন। গণিত শিক্ষার জন্য মন্টেসরী প্রথমে মুদ্রার সাহায্যে গণনা শিক্ষার কথা বলেন। এছাড়া ১০টি কাঠিতে ১ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দাগ দিয়ে শিশুকে সংখ্যাগুলো কাগজে কেটে তার উপর শিরিষ কাগজ বসানো হয়। শিশুরা এর উপর আঙ্গুল ঘুরিয়ে ও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে সংখ্যাগুলো লিখতে ও পড়তে শেখে। ধীরে ধীরে কাঠি, গুলি, বীচি ইত্যাদির সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শিক্ষা দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুদেরকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সক্রিয় রাখা হয়। বাস্তব জীবনভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা থাকায় শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা অর্জন করে। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যদি এভাবে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিশুদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাঠের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হবে। বিদ্যালয় পরিবেশও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. মন্টেসরীর মতে শিশুর মধ্যে কীভাবে শৃঙ্খলা গড়ে উঠে?
   ক. যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে
   খ. খেলাধুলার মাধ্যমে
   গ. সামাজিক শিক্ষা দিয়ে
   ঘ. বয়সোপযোগী আনন্দদায়ক কাজে নিযুক্ত রেখে

২. মন্টেসরী শিক্ষণ পদ্ধতিতে কীসের উপর জোর দেওয়া হতো?
   ক. চিত্রাঙ্কন, বাগানের কাজ, পশুপাখি পালন
   খ. নীরবতা অভ্যাস করা
   গ. ইন্দ্রিয়গত শিক্ষার সাথে পড়ালেখা ও গণিত শিক্ষণ
   ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

আ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতিতে --------- শিখনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।
২. মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা ছিল একজন ------- হিসেবে।
৩. মন্টেসরী বিদ্যালয়ে ------- সব কাজ নিজেরাই করে।
৪. এ পদ্ধতিতে ------ শিক্ষার পর পড়া লেখা ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।
৫. মন্টেসরী বিদ্যালয়ে ------ পদ্ধতিতে শিশুদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ব্যবস্থা আছে।

ই) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
২. এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলো কী ছিল? এ উপকরণগুলোকে কী বলা হয়?
৩. মন্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ঘ।
আ) ১। ব্যক্তিগত ২। সাহায্যকারী, ৩। শিশুরা, ৪। ইন্দ্রিয়গত, ৫। কর্মকেন্দ্রিক।

পাঠ - ৯

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি কী তা বলতে পারবেন ।
- কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন ।
- কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন ।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি

সক্রিয়তার নীতি

শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই কর্মচঞ্চল । যখনই কোনো শিশুকে লক্ষ করবেন দেখবেন সে কিছু না কিছু করছে । কেউ গাছে বেয়ে উঠছে, কেউবা প্রজাপতি ধরছে, কেউ দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করছে । কেউবা কাগজ দিয়ে উড়োজাহাজ বানিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে । কেউ মনোযোগ দিয়ে কিছু খুঁজছে, ছবি আঁকছে ইত্যাদি । অর্থাৎ সব সময়ই শিশু কোনো না কোনো কাজ করছে । সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায় । কর্মপ্রবণতা শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । এর মধ্য দিয়েই সে বিশ্বজগতকে জানতে চায় । তার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে এই কর্মপ্রবণতা বা সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই তার সামগ্রিক বিকাশ হয় । পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরী, ডিউই, হাবার্ট প্রভৃতি শিক্ষাবিদরা তাই শিক্ষণ শিখনে শিশুর এ কর্মপ্রবণতাকে বা সক্রিয়তাকে কাজে লাগানোর কথা বলে গেছেন । আধুনিক প্রায় সকল শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর সক্রিয়তাকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে । আমরা পূর্বের পাঠগুলো থেকে জেনেছি পরীক্ষণ পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, ফ্রয়েবেলের কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি ও মন্টেসরী পদ্ধতি শিশুর সক্রিয়তা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই সক্রিয়তাবাদের মূলে রয়েছে মনোবিজ্ঞানিদের ধারণা । মনোবিদরা বলেছেন জন্মের সময় শিশুরা কতগুলো প্রবণতা নিয়ে জন্মায় । এসব প্রবণতা তাকে সব সময় সক্রিয় রাখে । শিশুরা বেশিক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারে না । তাই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে শিশুকে রাখলে কোনো ভাল ফলও পাওয়া যায় না । শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হলে তার মনের প্রকৃতিগুলোকে কাজে লাগাতে হবে । মনোবিদরা শিশু মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, শিশুদের মন বিমূর্ত বিষয়কে গ্রহণ করার মত পরিপক্ক থাকে না । তাই শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে তার পক্ষে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয় না । তার শিক্ষাকে সহজ ও তার মনের উপযোগী করে মূর্ত করে তুলতে হবে । এদিক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তাকে বা কর্মপ্রবণতাকে কাজে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যায় ।

সক্রিয়তার নীতিকে গুরুত্ব দিলে শিশুরা ব্যক্তিগত কাজের সাথে সাথে দলগত কাজেরও সুযোগ পায় । কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিশুকে আকৃষ্ট করে । অন্যের কথা শুনে শেখার পরিবর্তে নিজেরা হাতে কলমে কাজ করে শিখে । কর্মকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দিলে শিশু তার এ শিখনকে আনন্দময় ও বৈচিত্রময় করে তুলে । সুতরাং বুঝতে পারছেন এই পরিবেশে শিশুই মূখ্য ভূমিকা পালন করে । এখানে শিক্ষকের কাজ গৌণ । তিনি থাকেন একজন পরামর্শক হিসেবে । বর্তমানের শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক

শিক্ষা। তার এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মতৎপর পদ্ধতির মাধ্যমে। কাজেই বুঝতে পারছেন কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিশু নিজে কাজ করে, তার শিক্ষক তাদেরকে সাহায্য করেন মাত্র।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্ব

কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর সৃজনাত্মক ও উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে নানা উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন-

- কাজের ফলে শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পুষ্ট হয়। ফলে কাজের দক্ষতা বাড়ে।
- কাজের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং বিভিন্ন উপকরণ, যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করে।
- কাজের ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, সে কাজের পরিকল্পনা করতে, গুছিয়ে কাজ করতে এবং কাজের ফলাফল মূল্যায়ন করতে শেখে।
- যে কোনো নির্দিষ্ট কাজের প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করার ফলে শিশু কার্য সম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত্ব করে।
- কাজের মধ্যে দিয়ে শিশু নিজেকে প্রকাশ করার এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলন করার সুযোগ পায়।
- যে কোনো কাজ সম্পর্কে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কাজকে ভয় করে না।
- শিশু কাজের মর্যাদা দিতে শেখে।
- কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুর সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়।
- কাজের মাধ্যমে দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।
- অনেকের সাথে কাজ করায় শিশুর মধ্যে নানা রকম সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে।

  যেমন–
  - অপরের প্রতি সহযোগিতা ও সমবেদনার মনোভাব গড়ে উঠে।
  - একে অপরের মতামতকে মর্যাদা দিতে শেখে।
- শিশুর কাজের ভিতর দিয়ে তার সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটে।

এবার ভেবে দেখুনতো প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত? আমরা যদি শিশুর বয়স, সামর্থ্য, মনমানসিকতা, আগ্রহ, প্রবণতা অনুযায়ী শিশুদেরকে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিয়োজিত রেখে শেখানোর কাজে সহায়তা করতে পারি, সৃষ্টিধর্মী ও উৎপাদনমুখী কাজের সুযোগ করে দিতে পারি, এর মধ্যে দিয়েই সে তার শিক্ষাকে আনন্দপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এ পদ্ধতিই হল কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করতে পারলে ভবিষ্যতে একজন কর্মক্ষম নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কর্মতৎপরতার পদ্ধতিতে কার ভূমিকা মূখ্য?
   ক. শিক্ষক
   খ. শিক্ষার্থী
   গ. পরিবেশ
   ঘ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর

২. কোন পদ্ধতিতে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা কাজের মর্যাদা দিতে শেখে?
   ক. প্রদর্শন
   খ. খেলাধূলা
   গ. বক্তৃতা
   ঘ. কর্মকেন্দ্রিক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলতে কী বুঝেন?
২. কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা কী?
৩. কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শ্রেণী শিক্ষণের সার্থকতা নির্ভর করে
   ক. ফলপ্রসূ দল গঠনের মাধ্যমে
   খ. বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমে
   গ. শ্রেণীতে শৃঙ্খলতা আনার মাধ্যমে
   ঘ. শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে

২. শিক্ষণ কৌশলের প্রথম করণীয় কাজটি কী?
   ক. আগ্রহ সৃষ্টি করা
   খ. উপকরণের ব্যবহার করা
   গ. বিষয়ের ব্যাখ্যা করা
   ঘ. কণ্ঠস্বরের উঠানামা করা

৩. "শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা"– কোন পদ্ধতির মূল কথা
   ক. বক্তৃতা
   খ. আলোচনা
   গ. প্রদর্শন
   ঘ. বক্তৃতা প্রদর্শন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণীকক্ষে কখন প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করা উচিত?

২. আলোচনা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার ও সুবিধা-অসুবিধাগুলো লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। ক, ৩। খ।

ইউনিট
৭

শিক্ষণ সমস্যা ও তার প্রতিকার

ভূমিকা

শিক্ষণ একটি দক্ষতামূলক কাজ। শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যুক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিভিন্ন দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় শ্রেণীতে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। এসব সমস্যা কখনও কখনও শিক্ষককে তার শিক্ষণ দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ সমস্যাগুলো ও তার প্রতিকার শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ও শিক্ষণ দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে শ্রেণী শিক্ষণ সমস্যা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারেন এবং শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ ও শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন। আর এভাবেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন।

শ্রেণীতে শিক্ষক নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হন। একটি শ্রেণীতে নানা ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। কিন্তু প্রতিভাবান বা উচ্চ মেধাসম্পন্ন, কেউবা মাঝারি মেধাসম্পন্ন আবার কেউবা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। শ্রেণীতে একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষক একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ধরন একই রকম না হলে সেক্ষেত্রে শিক্ষণে সমস্যা দেখা দেয়।

শিক্ষণের আর একটি প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীর সাথে সংযোগ স্থাপন। শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক হলেন যোগাযোগকারী। একজন সফল যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের গুরুত্ব কম নয়। তাই শিক্ষণে সফল যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের সংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় এটিও শিক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া শ্রেণী পরিবেশ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশও শিক্ষণের ক্ষেত্রে নানাভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে।

আলোচ্য ইউনিটে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয় তার প্রতিকার নিয়ে নিচের তিনটি পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১ : শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যাঃ অগ্রগামী, পশ্চাদগামী, প্রতিবন্ধী ও প্রতিকার

পাঠ-২ : শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যাঃ যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা; দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের অভাব এবং প্রতিকার

পাঠ-৩ : পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাঃ শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা ও প্রতিকার; বিদ্যালয়ের বহিঃপরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রতিকার

পাঠ - ১

শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা ঃ অগ্রগামী, পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা শনাক্ত করতে পারবেন।
- শিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূর করার উপায়গুলো জেনে তার প্রতিকার করতে পারবেন।

বুদ্ধক হিসাবে শিক্ষার্থীদের বিন্যাস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ থেকে ৬০ জন। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসব শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে। একই শ্রেণীতে পঠন পাঠন পদ্ধতি একরকম হওয়া সত্ত্বেও সব শিক্ষার্থীদের বিকাশ একই রকম হয় না। কোনো শিশু খুব সহজে পাঠের বিষয়বস্তু বুঝতে পারে আবার অনেক শিশু আদৌ পাঠ গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ একটি শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর বয়স এক হলেও সকলের মানসিক বিকাশ এক রকমের নয়। কোনো শিশু খুব বুদ্ধিমান। তারা সাধারণ জ্ঞানে তৃপ্ত হয় না। খুঁটিনাটি সবকিছু জানতে চায়। এ ধরনের শিশুরা খুব সহজে পাঠ উপলব্ধি করতে পারে এবং মনে রেখে প্রয়োগও করতে পারে। এমনকি শ্রেণীর অতিরিক্ত বিষয়ও তারা আয়ত্ত্বে আনতে পারে। এসব শিশুকে আমরা প্রতিভাবান বা অগ্রসর শিশু বলি। কিছু শিশু আছে যারা পাঠের বিষয়বস্তু ও কাজকর্ম মোটামুটিভাবে অনুসরণ করতে পারে। এদেরকে সাধারণ মেধাসম্পন্ন শিশু বলা হয়ে থাকে। আবার অনেক শিশু আছে যারা শ্রেণীর কাজ কখনও করতে পারে আবার কখনও করতে পারে না। এরা যে কোনো কাজে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে। তারা পাঠ সব সময় সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে, মনে রাখতে বা প্রয়োগ করতে পারে না। এদের বলা হয় পশ্চাদগামী শিশু। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। বুদ্ধি কম হলেও সাধারণ মেধার শিশুদের সাথে এদের একত্রে শিক্ষা দেওয়া যায়। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০-২৫ এর নিচে তাদেরকে জড়বুদ্ধি শিশু বলা হয়। এরা নিজেরা খেতে বা পরতে পারে না। সাধারণ বিদ্যালয়ে এদের জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। ৩০-৩৫ এর মধ্যে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারাও সমাজের বোঝাস্বরূপ। এরা জড়বুদ্ধি শিশুদের চেয়ে কিছুটা উপরের স্তরের। এরা নিজের কাজ কাজ কোনো রকমে করে ও সাধারণ কথাবার্তা বলে। বুদ্ধিহীন শিশু বলতে আমরা বুঝি যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০-৭০। খুব চেষ্টা করলে এরা সামান্য লেখাপড়া ও নানারকমের কাজ করতে পারে। তবে এরা স্বাধীনভাবে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এদের শারীরিক বিকাশের হার সাধারণের চেয়ে কম। অনেক সময় এদের দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। ভাষার বিকাশের হারও কম। লেখাপড়া ও কাজকর্মে সাধারণ শিশুদের চেয়ে অনেক পিছনে থাকে। এরা প্রতিবন্ধী শিশু। প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ বা এর উপরে হয়। তবে সাধারণ মেধার শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১২০। শ্রেণীতে শিক্ষক সাধারণত এদের বুদ্ধির মান, চাহিদা, আগ্রহ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান কার্যক্রম

পরিচালনা করেন। কিন্তু শিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, সাধারণ, পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশুর চাহিদা পূরণ না হলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই এদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়।

শ্রেণী শিক্ষণে অগ্রসর শিশুদের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

বিদ্যালয়ে সাধারণত মাঝারি বুদ্ধির শিশুদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতে উন্নত মেধা বা প্রতিভাবান শিশুরা আনন্দ পায় না। শ্রেণী শিক্ষণে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এদের পরিচালনা করা প্রয়োজন। প্রতিভাবান বা অগ্রসর শিশুরা যেমন তাড়াতাড়ি কাজ করে তেমনি কাজের স্বীকৃতিও কম। নিজেদের বুদ্ধি সম্পর্কে এরা সজাগ, খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে চায়। এরা যুক্তিবাদী হয়, অন্যের প্রশংসা চায়। এদের জন্য সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীদের সাথে অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে এ সমস্যার প্রতিকার করা যায়। যেমন–

- কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি যথা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রজেক্ট, শিক্ষাভ্রমণ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান ও অন্যান্য সৃজনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও পাঠাগারের অন্যান্য পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রেণীতে পুনরালোচনার সময় বা কোনো কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদেরকে কঠিন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।
- শ্রেণীতে বিভিন্ন কাজকর্মে তাদেরকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।
- সমস্যামূলক প্রশ্নের অবতারণা করে তাদেরকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে ও যুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষাকার্যে মাঝে মাঝে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনি সকলকে সক্রিয়তার মধ্যে রেখে শিক্ষা দেবেন। অগ্রসর শিশুরা অল্প সময়ে কাজ শেষ করে ফেলে এরপর তারা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে তাদের শান্ত রাখার একমাত্র উপায় এসব শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে সৃষ্টিশীল শিখন কাজের ব্যবস্থা করা। এতে তারা তৎপর হয়ে আনন্দের সাথে শিখন কাজ সম্পন্ন করবে।

পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যা ও তার প্রতিকার

শ্রেণী শিক্ষণে শিক্ষকের পক্ষে সব সময় সকলকে সমভাবে ব্যক্তিগত শিখনে সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এ কারণেও অনেক শিক্ষার্থী পাঠে পিছিয়ে পড়ে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে এরা সাধারণ শিশুদের চেয়ে অনেক পিছনে থাকে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ও মনোযোগের শক্তিও কম। প্রতিটি বিদ্যালয়েই পশ্চাদগামী শিশুরা আছে। আজকাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে সাধারণ

বিদ্যালয়েও এদের দেখা যায়। এদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা না থাকলে বিশেষ ব্যবস্থায় এদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। সমাজে যেন এরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেভাবে তাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিতে হবে। এদের সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা হলো–

- শিক্ষক এদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আচরণ করবেন। যেহেতু এদের মনোযোগের শক্তি কম সেহেতু মূর্ত বস্তুর সাহায্যে সহজভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।
- এরা যেন দৈনন্দিন কাজ শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- এদের সামাজিক আচার আচরণ শিক্ষা ও চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- এরা লেখাপড়ায় বেশি অগ্রসর হতে পারে না। এদের ভাষার বিকাশ ও উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে কোনো হাতের কাজ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করতে হবে।
- দৈহিক ত্রুটির জন্য যদি তারা অনগ্রসর থাকে সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক প্রতিবন্ধীর জন্য মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ ও সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
- কোনো কোনো দিকে তারা দুর্বল তা সনাক্ত করে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে হবে।
- নানারকমের কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। মাটির কাজ, কাঠের কাজ, বেতের কাজ, নানা রকমের হস্তশিল্প ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদাহরণ ছাড়া তারা কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারে না। তাই যত বেশি সম্ভব উদাহরণ দিতে হবে এবং শিখনে উৎসাহিত করতে হবে।
- পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় যত বেশি সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করতে হবে।
- তাদের জন্য অল্প বিষয়বস্তু নিয়ে ধীরে ধীরে শিক্ষা দেওয়া দরকার। একটি বিষয় পুরোপুরি আয়ত্ত্বে আসার পূর্বে অন্য শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

আপনার বিদ্যালয়ে যদি পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশু থাকে তাহলে অভিভাবকের সহযোগিতায় এসব শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত নিশ্চিত করবেন। সৃজনাত্মক ও উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে সকল প্রকার শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি ও বিশেষভাবে শ্রেণী পঠন পাঠনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন। তাদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলন ও বাড়ির কাজের ব্যবস্থা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. পশ্চাদগামী শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক কত?
   ক. ২০ থেকে ২৫
   খ. ৩০ থেকে ৫০
   গ. ৫০ থেকে ৭০
   ঘ. ৭০ থেকে ৯০

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কোন উক্তিটি যথার্থ?
   ক. এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১২০
   খ. এরা স্বাধীনভাবে যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে
   গ. এদের দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়
   ঘ. লেখাপড়া ও কাজকর্মে এরা সাধারণ শিশুদের মতো

৩. শ্রেণীতে সাধারণত কোন ধরনের শিশুদের বুদ্ধির মান, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়?
   ক. প্রতিভাবান
   খ. প্রতিবন্ধী
   গ. জড়বুদ্ধি
   ঘ. সাধারণ

৪. প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক কত?
   ক. ৯০ –১২০
   খ. ৮০ –১২০
   গ. ৭০ –১২০
   ঘ. ১২০ এর উর্ধ্বে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণী শিক্ষায় অগ্রসর শিশুদের সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

২. শ্রেণী শিক্ষণে পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যাগুলো কী? এ সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ঘ।

পাঠ - ২

শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা ঃ যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের অভাব এবং প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শিক্ষণ শিখনে যোগাযোগ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শ্রেণী শিক্ষণে যোগাযোগের প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবেন।
- শ্রেণী শিক্ষণে সফল যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- শ্রেণী শিক্ষণ শিখনে সফল যোগাযোগের অভাবে উদ্ভূত সমস্যা ও তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগাযোগ

যে কোনো কাজ সুষ্ঠু যোগাযোগের মাধ্যমে সুন্দরভাবে সমাধা করা যায়। শিক্ষণ শিখনে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একে অন্যের মাঝে তাদের চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা, ধ্যানধারণা, আদেশ নির্দেশ ও তথ্যের বিনিময় করে। শিক্ষণে সুষ্ঠু যোগাযোগ হলে শিক্ষার্থীকে শিখনের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়, শিখনে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয় এবং বাঞ্ছিত ফলাফল লাভ করা যায়। অর্থাৎ এসব ব্যবস্থার ফলে পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সফল যোগাযোগের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের পরিবর্তনের সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে, আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে। একজন শিক্ষকের ভূমিকা যথাযথ পালনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই দক্ষ শিক্ষককে হতে হবে একজন কুশলী যোগাযোগকারী।

শ্রেণী শিক্ষণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ফলপ্রসূ করতে হলে একজন শিক্ষকের তাই যোগাযোগ কী, যোগাযোগের গুরুত্ব, যোগাযোগের উপাদানসমূহ, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপায়, এর সমস্যা ও তার সমাধান কি করে করা যায় তার ধারণা থাকা প্রয়োজন। আলোচ্য পাঠে শ্রেণী শিক্ষণ শিখনে যোগাযোগের বিভিন্ন দিক, শিক্ষণে যোগাযোগের সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

যোগাযোগ কেন ও কীভাবে?

শিক্ষণে যোগাযোগ স্থাপিত হয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে। শিক্ষক নানা প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুগত তথ্য, ধারণা বা বক্তব্যের সাথে শিক্ষার্থীর মনের একটা সম্পর্ক বা যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে যোগাযোগকারীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি কথা বলে, লিখে, ছবি দেখিয়ে, অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহার করে, হাতে কলমে কাজ করিয়ে অথবা অন্য কোনো উপায়ে বিষয়বস্তুভিত্তিক তথ্য বা বক্তব্য শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেন। সহজ সরল ভাষায় ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে

অভিজ্ঞতা ও ধারণার আদান প্রদান হয়। তবে শিক্ষকের কাছে যে সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে তা হলো – কিভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সার্থক যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন করা যায়। এ কাজের সুবিধার জন্য নানা রকম কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিক্ষক হলো আদর্শ যোগাযোগকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী। এই যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। (১) প্রেরক, (২) তথ্য/বার্তা/সংবাদ, (৩) মাধ্যম, (৪) প্রাপক/গ্রাহক ও (৫) প্রতিবার্তা। শিক্ষণের সময় শিক্ষক মূলতঃ প্রেরকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা প্রাপক/গ্রাহকের (receiver) ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা তথ্য হলো বার্তা বা সংবাদ (message)। (মডেল ১ ও ২ দ্রষ্টব্য) শিক্ষক যখন কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে বিষয়বস্তুগত তথ্য বা বার্তা প্রেরণ করেন তখন তিনি শব্দ মাধ্যম ব্যবহার করেন। যখন তিনি চিত্রের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশ করেন তখন তিনি একই সাথে দর্শন মাধ্যম (visual medium) এবং শ্রবণ মাধ্যম (audio medium) ব্যবহার করেন। কখনও কখনও তিনি অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহারও করেন। কাজেই শিক্ষণের জন্য ভাষাভিত্তিক (verbal) সংযোগ ও ভাষাহীন (non-verbal) সংযোগ একান্তভাবে প্রয়োজন।

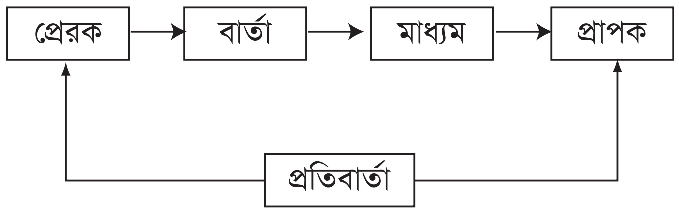

মডেল–১

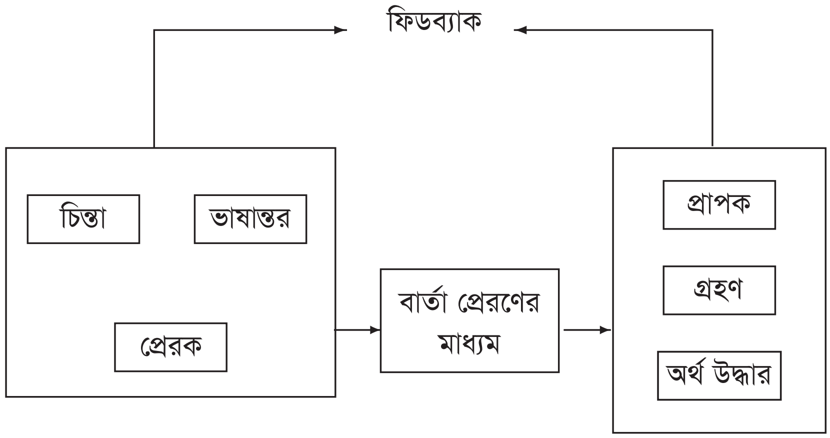

মডেল–২

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মডেল

প্রেরকের বার্তা পাওয়ার পর প্রাপক/গ্রাহক যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তা-ই প্রতিবার্তা। শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কাজে বার্তা গ্রহণ ও প্রতিবার্তা প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। এর মাধ্যমে শিক্ষক তার বার্তা শিক্ষার্থীদের কাছে কতটুকু বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে তা জানতে পারেন। সফল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবার্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রেরকের কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার পর প্রাপক যখন সেই বার্তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তখন প্রাপক প্রেরকের ভূমিকা পালন করে। শ্রেণীতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। আবার শিক্ষার্থীরা আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই প্রেরক ও প্রাপকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পারস্পরিক ক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। শ্রেণী শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে তাই দ্বিমূখী যোগাযোগ হয়ে থাকে। শিক্ষণের সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিপরীতমুখী যোগাযোগ স্থাপনের ফলে শিক্ষকের শিক্ষামূলক সংযোগ স্থাপন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটে। এ ধরনের সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পারস্পরিক ক্রিয়াসম্পন্ন যোগাযোগ। এই যোগাযোগ স্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীর দিক থেকে তথ্যাবলী নির্দিষ্ট মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শিক্ষকের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বৃত্তীয় পথে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হতে থাকে। এর ফলে একই সঙ্গে শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা (teaching skill), শিক্ষণ প্রক্রিয়া (teaching process) ও শিক্ষার্থীর শিখন (learning) তিনটি প্রক্রিয়ারই উন্নতি ঘটে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটানোর জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের উন্নত শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকের যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষণ শিখনের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করবেন কেন?

- শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য।
- তথ্যের শিখনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।
- শিক্ষার্থীকে শিখনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।
- প্রদত্ত তথ্যের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য।
- শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করার জন্য।
- বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য।
- শিক্ষণ শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য।

শিক্ষণে যোগাযোগের সমস্যা

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যদি সফল যোগাযোগকারীর ভূমিকা পালন করতে অপারগ হন তাহলে যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তা হলো–
- আদর্শ শিক্ষণ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় না।
- শিক্ষার্থীরা শিখনের প্রতি উদ্বুদ্ধ বা আগ্রহী হতে পারে না।
- যোগাযোগে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে না পারায় শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বিষয়বস্তুগত তত্ত্ব, তথ্য ও ধারণা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানতে

না পারলে শিক্ষকও পরবর্তী পর্যায়ের তথ্য সঠিকভাবে পরিবেশন করতে ব্যর্থ হন এবং কোনো রকম সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না।

- শিখন অসম্পূর্ণ থাকায় শিক্ষার্থীরা জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়।
- পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে শিক্ষক যোগাযোগের সময় সকল প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেন না। যার ফলে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীরা আস্থা হারিয়ে ফেলে, শিক্ষককে ক্রমেই অশ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করে, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার প্রতিকার

যোগাযোগ সম্পর্কিত সমস্যা নিরসন ও প্রতিকারের জন্য একজন শিক্ষকের কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে জ্ঞানমুলক, দক্ষতামূলক ও মনোভাবমূলক ও তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলো শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম করে তোলে।

জ্ঞানমূলক

- যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে জানা।
- শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার কলাকৌশল জানা।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা।
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ।
- শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

দক্ষতামূলক

- শিখনফল চিহ্নিত করে দক্ষতার সাথে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- অত্যন্ত সহজ ও পরিচিত শব্দ ব্যবহার করা।
- আকর্ষণীয়ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা।
- ধৈর্য্য সহকারে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য শোনা।
- কার্যকর ও উপযুক্ত উপকরণের ব্যবহার করা।
- কার্যকর প্রশ্ন করা।
- শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করা।
- বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা করা।
- আলোচনাকে অর্থবহ করে তোলা।
- বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উদাহরণ দেয়া।
- আনন্দময় শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা।

মনোভাবমূলক

- নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ।
- শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ।
- শিক্ষার্থীদের নিকট আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা ।
- শিক্ষার্থীর সমস্যা উপলব্ধি করা ও তা দূরীকরণের চেষ্টা করা ।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় চিন্তাভাবনা করে ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ করতে হবে । জটিল বাক্য, ভাবের অসংলগ্নতা, পুনরুক্তি, ভাবপ্রবণ কথাবার্তা, চরম মত প্রকাশক শব্দ, মানহানিকর এবং কুরুচিপূর্ণ শব্দ যেন ব্যবহার না করা হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষণ শিখনে যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?
   ক. বার্তা গ্রহণ
   খ. বার্তা প্রেরণ
   গ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বক্তব্য
   ঘ. বিষয়বস্তুগত ভাবের আদান প্রদান

২. যোগাযোগের জন্য কোনটির প্রয়োজন অত্যাবশ্যক?
   ক. প্রেরক
   খ. প্রাপক
   গ. মাধ্যম
   ঘ. বার্তা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?
২. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. শিক্ষণ শিখনে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষণ শিখনে সফল যোগাযোগের অভাবে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? এসব সমস্যা কীভাবে নিরসন করা যায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ, ২। গ।

পাঠ - ৩ শ্রেণী শিক্ষণে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায়গুলো বলতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ের বহিঃপরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারা ইউনিট ৫ এ বিস্তারিত জেনেছেন। এ পাঠে শ্রেণী শিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত এবং বিদ্যালয়ের বহিঃপরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও এগুলোর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে। আসুন প্রথমেই জানা যাক শ্রেণী শিক্ষণে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত কী কী সমস্যা হতে পারে এবং এগুলোর প্রতিকার কীভাবে করা যায়।

শ্রেণী শিক্ষণে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যা

- শ্রেণীতে একজন শিক্ষক অনেক শিক্ষার্থীকে একত্রে শিক্ষা দেন। এতে সব শিক্ষার্থীকে সমভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক শিক্ষার্থী পাঠে পিছিয়ে পড়ে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, সামার্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী পাঠের অবতারণা না করা হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আবর বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা করায় পাঠে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সমতালে চলতে না পেরে পাঠে পিছিয়ে পড়ে।
- শিক্ষণকে শিক্ষার্থীর আগ্রহভিত্তিক করতে না পারলে এবং কর্মতৎপরতার মধ্যে শিক্ষণ পরিচালনা করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা বাড়ে ও অমনোযোগী হয়।
- অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক যদি নিজের মতামত জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেন কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

- দিনের অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা যদি ভাল না হয় তার খারাপ প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনের ওপর প্রতিক্রিয়া করে।
- শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস না আসলে শিক্ষার্থীরা মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে পাঠে অমনোযোগী হয়ে পরে।
- শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান না থাকলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে যাতাযাত করার মত জায়গা পায় না। ফলে তারা অন্যের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। শ্রেণীকক্ষের স্থান অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে শিক্ষকের পক্ষেও শ্রেণীতে চলাফেরা করা ও সকলের প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণীতে ব্যবহার্য আসবাবপত্র যদি শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী না থাকে কিংবা আরামদায়ক না হয় সেক্ষেত্রেও নানারকমের সমস্যা হয়।
- উপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাসের অভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। উচ্চতা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা না করে যদি ইচ্ছানুযায়ী বসতে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় পেছনের শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ঠিকমত দেখতে পায় না। বোর্ডও দেখতে পায় না। ফলে শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
- কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা স্বভাবতই অমনোযোগী। এইসব শিক্ষার্থীদের একত্রে বসার সুযোগ দিলে শ্রেণীতে শ্রেণী শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

প্রতিকার

শ্রেণীতে সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করলে শিক্ষণ সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে–

- প্রাথমিক স্তরে ২০ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে শ্রেণী গঠন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন।
- যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে সমমানের ও একই রুচিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করতে হবে।
- কর্মতৎপরতার মধ্যে রেখে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ পাবে না।
- শিক্ষার্থীদের শাস্তির ভয় না দেখিয়ে তাদের সমস্যাগুলো সমবেদনার সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং সহানুভূতিশীল হয়ে এ সমস্যাগুলোকে তাদের সামনে তুলে ধরে সমস্যা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাপড়া করবে সে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও যথোপযুক্ত হতে হবে।
- শ্রেণীকক্ষের আকার শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত।

- শ্রেণীতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। চকবোর্ড এমনস্থানে টানাতে হবে যেন শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থী তা দেখতে পায় এবং তা থেকে যেন আলোক প্রতিফলিত না হয়।
- শ্রেণীতে বসার জন্য যে আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয় তা যথেষ্ট আরামদায়ক হওয়া দরকার।
- শিক্ষার্থীদের উচ্চতা অনুযায়ী সামনে/পিছনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের পৃথক পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষণে বিদ্যালয়ের বহিঃপরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা

- বিদ্যালয়ের অবস্থান যদি সমাজের কোলাহলপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে হয় তাহলে তার প্রভাব শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ সমাজ জীবনে মাঝে মাঝে যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় তার প্রভাব বিদ্যালয়ে এসে পড়ে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা নোংরা পরিবেশে অসুস্থ হয়ে শ্রেণীতে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।
- সাধারণত শিক্ষার্থীরা দিনের বেশির ভাগ সময় তাদের পিতামাতা, গুরুজন ও অন্যান্য খেলার সাথীদের সাথে কাটায়। এতে অন্যদের আচরণ তারা অনুকরণ করে। পিতামাতা ও গুরুজনরা যদি শিশুদের সাথে সঠিক আচরণ না করেন তাহলে সেইসব শিশুরা শ্রেণীকক্ষে অন্য শিশুদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে। বাড়ির এই প্রভাব বিদ্যালয়ের সকল ভাল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

প্রতিকার

- বিদ্যালয়ের অবস্থান যেন সমাজের কোলাহলপূর্ণ স্থানে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পরিবেশ যেন স্বাস্থ্যকর থাকে, বিদ্যালয়ের আশেপাশে যেন নোংরা আবর্জনা জমা না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।
- ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিশুদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এতে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা সহজ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

অ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার্য ---------- আরামদায়ক হওয়া উচিত ।
২. উপযুক্ত ---------- অভাবে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে ।
৩. শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের দল গঠন করার সময় যতদূর সম্ভব একই -------, ------- ও -------- সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দল গঠন করা উচিত ।
৪. শিশুদের ---------- মধ্যে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে পাঠে অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ থাকে না ।
৫. শ্রেণীতে এমনস্থানে ---------- স্থাপন করতে হবে যেন তা থেকে আলোক প্রতিফলিত না হয় ।
৬. শিক্ষার্থীদের ---------- অনুযায়ী শ্রেণীতে সামনে পিছনে বসার ব্যবস্থা করা উচিত ।
৭. বিদ্যালয় পরিবেশ সমাজের ---------- স্থানে হওয়া উচিত নয় ।
৮. বিদ্যালয় পরিবেশ যেন ---------- থাকে সেদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত ।
৯. ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিশুদের ---------- নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ---------- বজায় রেখে শিক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা সহজ হয় ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণে শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত কী কী সমস্যা হতে পারে? এ সমস্যাগুলো প্রতিকারের উপায় লিখুন ।
২. শিক্ষণে বিদ্যালয়ের বহিঃপরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা ও এসব সমস্যার প্রতিকারের উপায়গুলো লিখুন ।

সঠিক উত্তর

অ) ১ । আসবাবপত্র, ২ । শ্রেণী বিন্যাস, ৩ । বয়স, সামর্থ্য, একই রুচীসম্পন্ন, ৪ । কর্মতৎপরতা, ৫ । বোর্ড, ৬ । উচ্চতা, ৭ । কোলাহলপূর্ণ, ৮ । স্বাস্থ্যকর, ৯ । আচরণ, শৃঙ্খলা ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিম্নের কোনটি যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উপাদান নয়?
   ক. প্রেরক
   খ. টেলিফোন
   গ. সংবাদ
   ঘ. প্রতিবার্তা

২. শিক্ষণ-শিখনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে কার ভূমিকা মূখ্য?
   ক. শিক্ষার্থী
   খ. অভিভাবক
   গ. শ্রেণী-শিক্ষক
   ঘ. প্রধান শিক্ষক

৩. শ্রেণীতে পশ্চাদগামী ও প্রতিবন্ধী শিশু থাকলে কোনটি অবশ্যই নিশ্চিত করা উচিত?
   ক. সহানুভূতিশীল আচরণ
   খ. বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা
   গ. ব্যক্তিগত সাহায্য
   ঘ. বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণী শিক্ষণ-শিখনে যোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?

২. শ্রেণী শিক্ষণে উদ্ভূত শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাজনিত সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. যোগাযোগকারী হিসেবে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১।খ, ২।গ, ৩।ঘ।

ইউনিট
৮

শিক্ষণ-শেখানো সমস্যা

ভূমিকা

শিক্ষণ-শিখন একটি জটিল ও যৌথ প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে। অনেকগুলোর উপাদানের সমন্বয়ে আবর্তিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম। শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়ায় যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর কিছু শিক্ষক সম্পৃক্ত কিছু শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত। আলোচ্য ইউনিটে আমরা এই সমস্যাগুলো নিম্নের কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করবঃ

পাঠ-১	:	শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা
পাঠ-২	:	শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা
পাঠ-৩	:	মনিটরিয়েল পদ্ধতি ও বিশেষ শ্রেণী
পাঠ-৪	:	ইমপেক্ট পদ্ধতি

পাঠ - ১

শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সার্থক শিক্ষণে শিক্ষক সম্পর্কিত অন্তরায় চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- শিক্ষণ সমস্যা কাটিয়ে উঠার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন ।

আমাদের দেশে শিক্ষার নিম্নমুখী মান নিয়ে সর্বত্রই সমালোচনা শোনা যায় । প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী সকল শিক্ষার ভিত্তি । তাই প্রাথমিক শিক্ষা, তথা সকল শিক্ষার এই ভিত্তি দুর্বল থেকে গেলে শিক্ষার্থীর পরবর্তী শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক । এই বিপর্যয়ের জন্য শিক্ষকের দিক থেকে যেসব সমস্যা উল্লেখ করা যায় তা হচ্ছে–

শিক্ষণ সমস্যা

- শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাব
- অনুপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতি
- বিদ্যালয়ে আগমন-প্রস্থানে সময়ানুবর্তী না হওয়া
- বার্ষিক ও দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ না করা
- পেশাগত উন্নতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন
- শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্ন ও ভালবাসার অভাব
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে অনীহা
- দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার অভাব
- শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য পেশা গ্রহণ এবং তার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ।

শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে তাদের ব্যক্তিগত নানা প্রকার সমস্যা আছে । পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাও কম নয় । তবুও আমরা আশা করব শিক্ষকতার মর্যাদা রক্ষায় শিক্ষকগণ ব্রতী হবেন ।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করলে শিক্ষকদের শিক্ষণ সমস্যা অনেক কমে যাবে ।

সমস্যা সমাধানের কৌশল

- শিশুকে ভালভাবে জানা
- শিশুর পরিবেশকে জানা
- শিশুর মাতাপিতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ।
- দরিদ্র পরিবারের শিশুর অভাবের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া ও সম্ভবমত সাহায্য করা
- মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠদান করা – পাঠদান হবে কর্মকেন্দ্রিক ও জীবনভিত্তিক ।

- শিক্ষাদানের সময়ে শ্রেণীর অনুকূল পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সযত্নে ও সঠিকভাবে অনুসরণ করা ।

কোনো পেশার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর একটি বাণী উল্লেখ করা যেতে পারে, " তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি । মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ।" শিক্ষকগণ সমাজের সব চাইতে অধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি । তাই এ সম্পর্কে সর্বদা তাদের সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সার্থক শিক্ষাদানে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো কী কী?

২. কী কৌশল আয়ত্ব করলে শিক্ষণ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে?

পাঠ - ২

শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সার্থক শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অন্তরায়গুলো দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা আগে বলেছি, শিক্ষণ- শেখানো একটি যৌথ প্রক্রিয়া। শিক্ষক সার্থক শিক্ষণের জন্য যতই চেষ্টা করেন না কেন, শিক্ষার্থীর দিক থেকে নানা প্রকার সমস্যার কারণে তারা পাঠ গ্রহণে ব্যর্থ হতে পারে। এ সমস্যাগুলো নিম্নরূপ–

একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়সের ব্যবধান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে। তবুও যে বয়সের শিশু যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করার কথা, বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। ফলে একই শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সের শিশুরা পড়ে। বয়সের ব্যবধানের কারণে তাদের মধ্যে মেধা, রুচি, আগ্রহ ও পাঠ গ্রহণের ক্ষমতার বিভিন্নতা দেখা যায়। শিক্ষক এতে সমস্যায় পড়েন।

মেধার পার্থক্য

শিখন সমস্যার কারণ

একই বয়সের সকল শিশুর মেধা একরূপ হয় না। একই শ্রেণীর শিশুদের মেধার পার্থক্যের কারণে শিক্ষকের পাঠদানে সাফল্যের তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

আমাদের দেশে শহর ও গ্রামের পরিবেশে দুস্তর ব্যবধান। শুধু তাই নয়, শহুরে বা গ্রামীণ পরিবেশের শিশুদের মধ্যেও পারস্পরিক ব্যবধান অনেক। ফলে একই শ্রেণীর শিশুদের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার কারণে পাঠ গ্রহণে তারতম্য ঘটে।

শিখন প্রস্তুতির অভাব

শিখন প্রস্তুতি শিখনের সাফল্যের পূর্বশর্ত। একই বয়সের সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষণ প্রস্তুতি একই সময় হয় না। শিখন প্রস্তুতির ব্যবধানের কারণে শিশুরা একই পাঠ একইভাবে গ্রহণে সমর্থ হয় না।

পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়তার অভাব

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে পাঠ উপস্থাপন করেন, বাড়িতে তা অধ্যয়নে শিশুদের সহায়তা প্রয়োজন। নিরক্ষর অভিভাবক নিজে এই সহায়তা দানে অসমর্থ এবং অনেক পরিবারেই শিশুদের পাঠপ্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা দিতে পারে এমন কেউ থাকে না।

দারিদ্র

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীনতা লাভে সবচেয়ে বড় অন্তরায় অভিভাবকের দারিদ্র্য। "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি সত্ত্বেও এ সমস্যা এখনো প্রকটরূপে বিদ্যমান।

রোগব্যাধি

বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিশু নানা রোগ ব্যাধিতে ভোগে। অনেকেই সুচিকিৎসার সুযোগ পায় না। অপুষ্টিজনিত কারণে ভগ্ন স্বাস্থ্য শিশুরা দৈনন্দিন শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয় না।

শিখন সমস্যা দূরীকরণ

শিশু শিক্ষার উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো অগণিত সমস্যর কয়েকটি মাত্র। এগুলো সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এসব সমস্যার প্রভাব কিছুটা সীমিত করে শিক্ষণ-শিখানো কাজকে সার্থক করাতে পারেন। নিম্নে তার কতিপয় ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো–

জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধকরণ

শিক্ষকগণ শিশু জরিপে আন্তরিক হলে অভিভাবকগণকে শিশুর সঠিক বয়স তথ্য প্রদানে সম্মত করতে পারেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্ম তারিখ রেকর্ড করার ব্যবস্থা করতে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

মেধা ও মানসিক প্রস্তুতির বিবেচনা

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে শিক্ষক শিশুদের মেধা ও মানসিক প্রস্তুতির প্রতি নজর রেখে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

শিখন প্রস্তুতি বিবেচনা

শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে জানা, তাদের প্রস্তুতি পরিমাপ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদান শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ

শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিশুদের, এমননি অভিভাবকদের জ্ঞান দিতে পারেন। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করার চেষ্টা করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সার্থক শিখনে শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

২. শিক্ষক কীভাবে এসব সমস্যার প্রভাব হ্রাস করতে পারেন বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৩ মনিটরিয়েল পদ্ধতি ও বিশেষ শ্রেণী (স্পেশাল ক্লাস)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মনিটরিয়েল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্পেশাল ক্লাসের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।

অতীতে আমাদের দেশে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী বা মনিটরকে দিয়ে নিচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মনিটরিয়েল পদ্ধতি বলা হয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে এই প্রাচীন মনিটরিয়েল পদ্ধতি লোপ পায়। ইদানিং এই মনিটরিয়েল পদ্ধতি প্রাথমিক স্তরে পুনরায় প্রচলনের ধারা দেখা যাচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা দানের কিছু সুবিধা রয়েছে।

সুবিধা

- যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব নয় সে সব প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে মনিটরের সাহায্যে কোন কোন ক্লাস নেওয়া যেতে পারে।
- সতীর্থদের শিক্ষাদান করতে হচ্ছে বলে মনিটর পাঠদানের বিষয়টি আগে নিজে ভালভাবে রপ্ত করতে চেষ্টা করে। ফলে তার নিজের পাঠ্যাভাসে অগ্রগতি সাধিত হয়।
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের সতীর্থকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আনন্দিত হয় এবং শিখনের জন্য তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- আমাদের দেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। তদুপরি শিক্ষকের অনুমোদিত ও অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে মনিটরিয়েল পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

অসুবিধা

- মনিটর নিজেই তার শ্রেণীর সহপাঠীদের সমতুল্য। কাজেই তার পক্ষে শিক্ষকের ন্যায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়।
- যে সময় মনিটর অপর ছাত্রদের পাঠদানে ব্যাপৃত থাকে সে সময় সে তার নিজের ক্লাসের পাঠ গ্রহণে বঞ্চিত থেকে যায়। তার এই ক্ষতি অপূরণীয়।
- মনিটরদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা জাগ্রত হতে পারে এবং তাতে তাদের সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্পেশাল ক্লাস

মনিটরিয়েল পদ্ধতি ফলপ্রসূ করার জন্য বিশেষ ক্লাস গঠন প্রয়োজন হতে পারে। নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে–

- পাঠ্যসূচির সহজ অংশ শিক্ষাদানের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বিশেষ দল গঠন করে উচ্চতর শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রকে দিয়ে শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যাংশের পাঠদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বিদ্যালয় ছুটির প্রাক্কালে নিচের শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিশেষ ক্লাস গঠন করে মনিটর ছাত্রকে দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের পঠন পাঠন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন- শতকিয়া পড়া, নামতা শেখা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি।
- স্কাউট ও কাব দল নিজেদের মধ্য থেকে দল নেতার নেতৃত্ব বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদনে ব্রতী হতে পারে।
- সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর অংশ হিসেবে বাগান করা, বিশেষ খেলা প্রদর্শন, বিদ্যালয় গৃহ ও আঙ্গিনা পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজের জন্য শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ দল গঠন করে দিয়ে দল নেতার তত্ত্বাবধানে উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

অ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. অতীতে আমাদের দেশে ---------- পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

২. মনিটরের সহায়তায় ----------, ---------- ও ---------- শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যায়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মনিটরিয়েল পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়? এই পদ্ধতির কী কী সুবিধা ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়?

২. স্পেশাল ক্লাসের জন্য কীভাবে শ্রেণী সংগঠন করা যায়?

অ) সঠিক উত্তর

১। মনিটরিয়েল, ২। শতকিয়া পড়া, নামতা শেখা ও কবিতা আবৃত্তি।

পাঠ - ৪

ইমপেক্ট পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ইমপেক্ট পদ্ধতির অর্থ বলতে পারবেন।
- ইমপেক্ট পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গতি ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টায় যে সমস্ত নবতর পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সংক্ষেপে তার নাম ইমপেক্ট। ইমপেক্ট শব্দটি Instructional Management by the Parents, Community and Teachers কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি অভিভাবক, সমাজ ও শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত একটি শিক্ষা পদ্ধতি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় এই পদ্ধতির উদ্ভাবন ও পরীক্ষণ দেখা যায়। বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইমপেক্ট পদ্ধতি কতিপয় এলাকায় পরীক্ষণমূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association - IDA) এর উদ্যোগে জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক- এর আর্থিক সহায়তায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রজেক্টসমূহে কতিপয় উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদের একটি ছিল ইমপেক্ট। এটি অভিভাবক সমাজ ও শিক্ষকের ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক ১৫০-২০০ জন শিক্ষার্থীর শিখন কাজ তদারক করতে পারেন। ইমপ্যাক্ট কার্যক্রমে পড়ার উপযোগী করে পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হয়। এই শিক্ষা উপকরণকে মড্যুলও বলা হয়।

টাঙ্গাইল জেলার ১৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইমপেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দান প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বাস্তবে সফল হয়নি। কালক্রমে এই পদ্ধতি পরিত্যাক্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

অ) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ইমপেক্ট ----------, ---------- ও ---------- দ্বারা পরিচালিত একটি শিক্ষা পদ্ধতি।

২. বাংলাদেশের ---------- প্রবর্তনের লক্ষ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে ---------- পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ইমপ্যাক্ট পদ্ধতি পরীক্ষামূলক প্রবর্তনের উপর একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

ই) সঠিক উত্তর

১। অভিভাবক, সমাজ, শিক্ষক

২। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ইমপেক্ট।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষণ-শিখানোর ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি শিক্ষক সম্পর্কিত সমস্যা?
   - ক. দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতার অভাব
   - খ. মানসিক প্রস্তুতির অভাব
   - গ. বয়সের ব্যবধান
   - ঘ. প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্পেশাল ক্লাসের জন্য কীভাবে দল গঠন করা প্রয়োজন?
   - ক. কোনো সাধারণ পাঠদানের জন্য
   - খ. স্কাউট ও ক্লাব গঠনের জন্য
   - গ. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য
   - ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখানোর ক্ষেত্রে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো দূরীকরণের উপায় লিখুন।

২. স্পেশাল ক্লাস গঠন পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষার্থীর প্রধান সমস্যা উল্লেখ করুন এবং এগুলো প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ।

সংযোজন -১

প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ঃ

[বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ ইং তারিখে প্রকাশিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০/১লা ফাল্গুন, ১৩৯৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলো ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১লা ফাল্গুন, ১৩৯৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনসমূহ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে–

১৯৯০ সনের ২৭ নং আইন

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

যেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম–** এই আইন প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলকরণ) আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা –** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই আইনে–

ক) **“অভিভাবক”** অর্থ শিশুর পিতা বা পিতার অবর্তমানে মাতা বা উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন এমন কোনো ব্যক্তি;

খ) **“কমিটি”** অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে গঠিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি;

গ) **“প্রাথমিক শিক্ষা”** অর্থ শিশুদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত শিক্ষা;

ঘ) **“প্রাথমিক শিক্ষা** প্রতিষ্ঠান” অর্থ যে কোনো সরকারী বা বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে;

ঙ) **“শিশু”** অর্থ ছয় বৎসরের কম নহে এবং দশ বৎসরের অধিক নহে এইরূপ বয়সের যে কোনো বালক বা বালিকা।

৩। **প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ–**

(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা দেশের যে কোনো এলাকায় যে কোনো তারিখ হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

(২) যে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে সেই এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক তাহার শিশুকে, যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় অবস্থিত তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত "যুক্তিসঙ্গত কারণ" বলিতে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে বুঝাইবে, যথা ঃ-

ক) অসুস্থতা বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা সম্ভব না হওয়া;

খ) শিশুর আবাসস্থল হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা;

গ) আবেদন করা সত্ত্বেও শিশুকে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইতে না পারা;

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিবেচনায় শিশু বর্তমানে যে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের হওয়া;

ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিবেচনায় শিশুর মানসিক অক্ষমতার কারণে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো বাঞ্ছনীয় না হওয়া।

(৪) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে সেই এলাকার কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য হাজির হওয়ার ব্যাপারে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোনো কাজকর্মে ব্যাপৃত রাখিতে পারিবেন না।

৪। **বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি-**

(১) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে সেই এলাকায় ইউনিয়ন বা পৌর এলাকাসমূহের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) কোনো ইউনিয়নের ওয়ার্ডের জন্য কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড মেম্বার, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা;

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(৩) কোনো পৌর এলাকার ওয়ার্ডের জন্য কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ

(ক) পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বা পৌর সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড কমিশনার, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ওয়ার্ড কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ;

(গ) ওয়ার্ড কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা;

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(৪) যদি কোনো ওয়ার্ডে একাধিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকটির প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কমিটির সদস্য হইবেন এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বা পৌর সভার চেয়ারম্যান তাহাদের মধ্যে হইতে কে কমিটির সচিব হইবেন তা নির্ধারণ করিবেন।

৫। **কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য–**

(১) কমিটি উহার এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং রীতিমত হাজিরা নিশ্চিত করিবে এবং এতদ্দুশ্যে কমিটি উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) কমিটি উহার এলাকায় বসবাসরত সকল শিশুর একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং উহাতে প্রত্যেক শিশুর নাম, অভিভাবকের নাম ও শিশুর বয়স উল্লেখ থাকিবে এবং উহাতে এই আইনের অধীন যাহারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে বাধ্য এবং যাহারা এই ভর্তি হইতে অব্যহতি পাওয়ার যোগ্য তাহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রণীত তালিকা প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সংশোধিত হইবে এবং এই সংশোধিত তালিকা হইতে যাহারা নববর্ষের শুরুতে শিশু থাকিবে না তাহাদের নাম বাদ পড়িবে এবং যাহারা শিশু হইবে তাহাদের নাম উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তালিকা এবং উপধারা (৩) এ উল্লিখিত সংশেধিত তালিকার একটি করিয়া অনুলিপি প্রাথমিক শিক্ষা

অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক বৎসরের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাহার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া শিশুদের নামের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী মাসে অন্ততঃ সাত দিন অনুপস্থিত ছিল এইরূপ শিশুদের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৭) যে ক্ষেত্রে কমিটি দেখিতে পায় যে, উহার তালিকাভুক্ত কোনো শিশু যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কেন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় নাই বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বিনা অনুমতিতে মাসের মধ্যে অন্ততঃ সাত দিন অনুপস্থিত রহিয়াছে সেক্ষেত্রে কমিটি শিশুর অভিভাবকের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে বিষয়টি তদন্ত করিয়া উক্ত অভিভাবককে ভর্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে, উহার শিশুকে কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইবার জন্য এবং অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহার যথারীতি উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার জন্য লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে পারিবে।

৬। **দণ্ড–**

(১) যদি কোনো কমিটি এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে, উহার প্রত্যেক সদস্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো অভিভাবক ধারা ৫ (৭)-এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে পরপর তিনবার ব্যর্থ হন তাহা হইলে তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ–** কমিটির চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা–** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান

সচিব

গ্রন্থপঞ্জী

১। অধ্যাপক সুশীল রায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন।
২। আবদুল হাকিম, আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান।
৩। আহসানিয়া মিশন, শিক্ষানীতি।
৪। আহসানিয়া মিশন, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন।
৫। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪।
৬। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮।
৭। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষানীতি পরিচিতি।
৮। বিভূতি রঞ্জন গুহ, শিক্ষায় পথিকৃৎ।
৯। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড ঃ অত্যাবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা)।
১০। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল।
১১। প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, শিক্ষানীতি।
১২। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল।
১৩। হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা।
১৪। মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা।
১৫। ড. অরুণ ঘোষ, শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব।
১৬। শামসুল কবীর ও ড. এম. আব্দুল ওহাব, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা।
১৮। Robert Ulich, History of Educational Thought.
১৯। Samuel Smith, Ideas of the Geat Educators.
২০। Sharifa Khatun, Teacher Education.
২১। T. Rayment, The Principles of Education.
২২। M. V. Daniel, Activity in Primary School.